POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ
وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا
عَلَى الْخٰشِعِيْنَ

‘হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর; এবং নিশ্চয় বিনয়ীগণ ব্যতিরেকে (অন্যান্যদের জন্য) ইহা বড়ই কঠিন।

(আল-বাকারা: ৪৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 14-15

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 3-10 Apr, 2025 4-11 শওয়াল-1446 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা’লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ এই একটি বাক্য থেকেও রমযান মাসের মহত্ব ও গুরুত্ব প্রকাশ পায়। সুফিগণ লিখেছেন, এই মাসটি হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য উৎকৃষ্ট মাস। এই মাসে বিপুল হারে দিব্যদর্শন লাভ হয়। নামায মানুষের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে আর রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

মগরিবের নামাযের কিছুক্ষণ পূর্বে রমযান মসের চাঁদ দেখা গেল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মগরিবের নামাযের পর চাঁদ দেখার জন্য মসজিদের ছাদে এলেন। চাঁদ দেখার পর তিনি মসজিদে ফিরে এলেন।

তিনি বললেন: এমন মনে হচ্ছে বিগত রমযান কালকেই যেন অতিবহিত হয়েছে। شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ এই একটি বাক্য থেকেও রমযান মাসের মহত্ব ও গুরুত্ব প্রকাশ পায়। সুফিগণ লিখেছেন, এই মাসটি হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য উৎকৃষ্ট মাস। এই মাসে বিপুল হারে দিব্যদর্শন লাভ হয়। নামায মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে আর রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার অর্থ নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মার কামনা-বাসনা থেকে দূরত্ব তৈরী হওয়া এবং হৃদয়ে আলোকিত করার অর্থ কাশফ বা দিব্যদর্শনের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া অর্থাৎ খোদার সাক্ষাত দর্শন হওয়া।

অতএব اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ আয়াতে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রোযার প্রতিদান মহান। কিন্তু রোগব্যাধি ও ব্যস্ততা মানুষকে এই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত রাখে। আমার স্মরণে আছে, যৌবনে একবার আমি স্বপ্নে দেখি যে, রোযা রাখা আহলে বায়ত-এর সুন্নত। খোদার পয়গম্বর আমার সম্পর্কে বলেছেন- سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ । সালমান অর্থাৎ ‘সুলহান’ যার অর্থ এই ব্যক্তির হাতে দুটি মীমাংসা থাকবে। একটি অভ্যন্তরীণ এবং অপরটি বাহ্যিক। আর সে মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে নিজের কাজ করবে, অস্ত্রের দ্বারা নয়। আর আমি হুসাইনের পথ অবলম্বন করি নি, যিনি যুদ্ধ করেছেন, বরং হাসানের পথ অবলম্বন করেছি, যিনি যুদ্ধ করেন নি। আমি উপলব্ধি করলাম, এটি রোযার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই আমি ছয় মাসের রোযা রাখলাম। এই সময়ে আমি দেখলাম, জ্যোতির স্তম্ভ আকাশের দিকে যাচ্ছে আর এটা অস্পষ্ট যে, জ্যোতির স্তম্ভগুলি মাটি থেকে আকাশের দিকে যাচ্ছে, না কি আমার হৃদয় থেকে। কিন্তু এই সব কিছু যৌবনেই সম্ভব ছিল। আর সেই সময় আমি চাইলে চার বছর পর্যন্ত রোযা রাখতে পারতাম।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ:৪২৪)

রোযা এজন্য মানুষকে থাকার আদেশ দেওয়া হয় নি যে তার কোন কষ্টই হবে না আর সে কোন দুর্বলতা অনুভব করবে না। বরং রোযা রাখার আদেশ এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে সে দুর্বলতা সহনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অতএব, দুর্বলতার ভয়ে রোযা ত্যাগ করা কোনওক্রমেই বৈধ নয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: রোযার প্রতি শরিয়তে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একদিকে যেমন রোযার বিষয়ে মাত্রাধিক কট্টরতা অবৈধ তেমনি মাত্রাধিক শিথিলতাও অবৈধ। এতটা কঠোরতাও করা উচিত নয় যে প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয় আবার এতটা শিথিলতাও দেখানো উচিত নয় যাতে শরিয়তের আদেশের অবমাননা হয় আর বিভিন্ন ছুতোয় দায়িত্ব এড়ানো হয়। আমি দেখেছি, অনেকে কেবল দুর্বলতার অজুহাতে রোযা রাখে না। কেউ কেউ আবার বলে রোযা রাখলে আমাশয় হয়। অথচ এগুলি রোযা ত্যাগ করার কোন বৈধ অজুহাত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাশয় না হয় রোযা রাখা জরুরী। (রোযা রাখা অবস্থায়) আমাশয় হলে রোযা ত্যাগ করতেও পারে। অনুরূপভাবে কেউ কেউ বলে, রোযা রাখলে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও কোন যুক্তি নয়। কেবল সেই দুর্বলতার কারণে রোযা ত্যাগ করা বৈধ যখন ডাক্তার রোযা রাখতে নিষেধ করে। অন্যথায় দুর্বলতা তো অনেকের নিত্যসঙ্গী। তবে কি তারা কখনও রোযা রাখবে না? আড়াই- বা তিন বছর আমার বয়স ছিল, যখন আমার কালো কাশি হয়েছিল। সেই তখন থেকে আমার শরীর অসুস্থ। যদি এমন অসুস্থতার অজুহাত দেওয়া বৈধ হয় তবে হয়তো আমার আজীবন একটি রোযার সুযোগ হত না। এই যে দুর্বলতা জাতীয় অজুহাতকে সামনে রেখে রোযা ত্যাগ করার সুযোগ সন্ধান করা হয়, এই সংযম অনুশীলনের জন্যই তো রোযা রাখা হয়। যেমনটি এর উপমা কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে- নামায অসৎ কর্ম এবং অশ্লীলতা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এখন যদি কেউ বলে, আমি নামায এজন্য পড়ি না যে এর কারণে অসৎ কর্ম করা থেকে আমি বাধাপ্রাপ্ত হই। অতএব, রোযার উদ্দেশ্যই তো দুর্বলতা সহন করার অভ্যেস গড়ে তোলা। নচেত যে কেউ বলতে পারে যে সে রোযা রাখে না কারণ ক্ষুধা ও পিপাসা তার জন্য কষ্টকর। অথচ এই ধরণের কষ্ট সহন করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যই রোযা নির্ধারিত হয়েছে। যে ব্যক্তি রোযা রাখে, সে কি চায় ফিরিশতারা সারা দিন তার পেটে কাবাব ঠুসে ভরতে থাকবে? সে রোযা রাখলে তাকে অবশ্যই ক্ষুদপিপাসা সহন করতে হবে আর কিছুটা দুর্বলতাও হবে। এই দুর্বলতা সহন করার অভ্যাস গড়ে তোলর জন্য রোযা রাখা হয়। রোযার অবশ্য আরও অন্যান্য অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা রয়েছে। যেমন রোযা রাখলে অভাবপীড়িত ও অভুক্ত মানুষদের সাহায্যের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। কিন্তু আর যাইহোক রোযা এজন্য মানুষকে থাকার আদেশ দেওয়া হয় নি যে তার কোন কষ্টই হবে না আর সে কোন দুর্বলতা অনুভব করবে না। বরং রোযা রাখার আদেশ এই কারণে দেওয়া হয়েছে যাতে সে দুর্বলতা সহনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অতএব, দুর্বলতার ভয়ে রোযা ত্যাগ করা কোনওক্রমেই বৈধ নয়।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

কেননা মহানবী (সা.) এর জীবনচরিত ছিলো সবার জন্য উন্মুক্ত পুস্তকের ন্যায়; যিনি যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সবাইকে নির্দেশ দিতেন যে, সাবধান! (যুদ্ধের সময়) কোন শিশু, নারীকে হত্যা করবে না, এমনকি অকারণে গাছও যেন কাটা না হয়।

যিনি পশুদেরকেও কোন কষ্টে দেখতে পারতেন না তিনি কিভাবে মানুষের প্রতি অত্যাচার ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) তির লাগার কারণে আহত হয়ে পড়েন। তির লাগার কারণে তাঁর (সা.) কাপড় ছিঁড়ে যায়। মহানবী (সা.) তির বের করেন। এরপর তিনি এক মুষ্টি কঙ্কর নিয়ে সেই দুর্গের দিকে নিক্ষেপ করেন, যার ফলে তাদের দুর্গ কাঁপতে থাকে। এমনকি মুসলমানরা ইহুদিদের পাকড়াও করে এবং দুর্গ জয় হয়।

আঁ হযরত (সা.) পবিত্র ছিলেন আর তাঁর সম্মান সর্বোপরি। তিনি ছিলেন ন্যায় ও দয়ার মূর্তপ্রতীক। যে রেওয়ায়াত তাঁর বিরুদ্ধে যায় তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কিনানা বিন রাবি নিহত হয়, কিন্তু এর কারণ ছিল একজন মুসলমান সেনাপতিকে হত্যা করা, যার মুক্তিপণ হিসেবে সে নিহত হয়েছিল। এটিই প্রকৃত সত্য।

খায়বারের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ও আঁ হযরত (সা.)–এর জীবনী

মাননীয় মাস্টার মনসুর আহমদ কাহলোঁ (অধুনা অস্ট্রেলিয়া নিবাসী)–এর স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (১৪ তবলীগ, ১৪০৪ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,খায়বারের যুদ্ধের আলোচনা করা হচ্ছিল, এখন খায়বারের দ্বিতীয় দুর্গ জয়ের কথা উল্লেখ করবো। এটি 'সা'দ বিন মুআয দুর্গ' নামে পরিচিত। খায়বারের অন্যান্য দুর্গের চেয়ে এই দুর্গে অধিক খাদ্যদ্রব্য, গবাদি পশু এবং সাজসরঞ্জাম ছিল এবং এখানে পাঁচশ' যোদ্ধা বসবাস করতো। হযরত কা'ব বিন উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তারা তিন দিন পর্যন্ত 'সা'দ বিন মুআয দুর্গ' অবরোধ করে রাখেন। এটি একটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। হযরত মুয়াত্তিব আসলামী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, খায়বারে বনু আসলামকে চরম ক্ষুধার সম্মুখীন হতে হয়। তখন বনু আসলাম, হযরত আসমা বিন হারেসা (রা.)–কে মহানবী (সা.)–এর কাছে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। বনু আসলাম (গোত্র) হযরত আসমা বিন হারেসা (রা.)–কে বলে, মহানবী (সা.)–এর সমীপে আমাদের সালাম পৌঁছাবে এবং নিবেদন করবে, আমরা ক্ষুধা ও দুর্বলতায় জর্জরিত, অবস্থা খুবই শোচনীয়। হযরত আসমা (রা.) তাঁর সমীপে বনু আসলামের সালাম পৌঁছে দেয় (আর) নিবেদন করে, ক্ষুধা এবং দুর্বলতা আমাদেরকে চরমভাবে উৎকণ্ঠিত করে রেখেছে। তাই আপনি (সা.) আল্লাহ্‌র সমীপে আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি (সা.) দোয়া করেন এবং বলেন, 'সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার কাছে কিছুই নেই যদ্দারা আমি তোমাদের শক্তি জোগাতে পারি। আমার কাছে খাবারের মতো কিছুই নেই। আমি তাদের দুরাবস্থা অনুধাবন করতে পারছি, যারা এখন ক্ষুধার যন্ত্রনায় কাতর।' এরপর এই দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্! মুসলমানদের সেই দুর্গ জয় করার সামর্থ দান কর যা খাদ্যদ্রব্য ও চর্বিতে পরিপূর্ণ।' এরপর তিনি (সা.) যুদ্ধের জন্য হুব্বাব বিন মুনযের (রা.)–র হাতে পতাকা তুলে দেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ:১২১,১২২)

এর বিশদ বিবরণে উল্লেখ করা হয় যে, ইহুদীদের মধ্য হতে একজন সম্মুখ যুদ্ধের জন্য (দুর্গের) বাইরে আসে যার নাম ছিল ইউশা'। সে প্রতিদ্বন্দ্বীতার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করলে তৎক্ষণাৎ হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) তার মোকাবিলার জন্য আসেন। তারা যুদ্ধ করতে থাকে, অবশেষে হযরত হুব্বাব (রা.) তাকে হত্যা করেন। এরপর যিয়াল নামের আরেকজন ইহুদী সম্মুখ যুদ্ধের আহ্বান করলে হযরত উম্মারাহ্ বিন উকবা গিফারী (রা.) তার মোকাবিলার জন্য বের হন এবং এগিয়ে গিয়ে সেই ইহুদীর মাথায় মোক্ষম আঘাত করেন, ফলে তার মাথা ফেটে যায়। হযরত উম্মারাহ্ বিন উকবা গিফারী (রা.) বলেন, আমি হলাম একজন গিফারী যুবক! তখন সাহাবীরা বলেন, এর জিহাদ পণ্ড হয়ে গেল। অর্থাৎ, তখন তিনি এই ধ্বনি উচ্চকিত করেন, অথবা গোত্রীয় গর্ব প্রকাশ করে নারাধ্বনি উচ্চকিত করেন আর বলেন, আমি গিফ্‌ফারী। সাহাবীরা বলেন, এটি ভালো কথা নয়। তুমি আত্মগর্ব প্রদর্শন করেছ। এ বিষয়টি মহানবী (সা.)–এর সমীপে উল্লেখ করা হলে তিনি (সা.) বলেন, কোনো সমস্যা নেই। সে প্রতিদান পাবে (এবং) তার প্রশংসাও করা হবে। এমন ক্ষেত্রে যদি এরূপ করা হয়ে থাকে তাহলে ক্ষতির কিছু নেই।

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)কে তির নিক্ষেপ করতে দেখেছি; তাঁর একটি তিরও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন।

হযরত হুব্বাব বিন মুনযের (রা.) তাঁর অধীনস্ত যোদ্ধাদের নিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করে তুমুল লড়াই করে সেটি জয় করেন এবং সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং খাদ্যশস্য করতলগত করেন। দুর্গের প্রতিরোধকারী অনেক ইহুদী নিহত হয় এবং অনেকে বন্দি হয়। হযরত মুয়াত্তিব আসলামী (রা.), যিনি মহানবী (সা.)–এর সমীপে ক্ষুধার তাড়নায় দোয়ার আবেদন নিয়ে এসেছিলেন, তিনি বলেন, আমাদের ফিরে আসার পূর্বেই আল্লাহ্ সা'দ বিন মুআয দুর্গ জয় করার সামর্থ দান করেন। অর্থাৎ আমরা কথা বলে কেবলই ফেরত এসেছিলাম। ক্ষুধার জ্বালায় শোচনীয় অবস্থার কথা সবেমাত্র মহানবী (সা.)–এর সমীপে এই নিবেদন করে ফিরে আসি, এরইমধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বিজয়ও (অর্জিত) হয়। হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সা'দ দুর্গ থেকে যে পরিমান খাদ্যদ্রব্য হস্তগত হয় সেপরিমাণ অন্য কোনো দুর্গ থেকে পাওয়া যায় নি। এর মধ্যে অনেক জব, খেজুর, ঘী, মধু, তেল এবং চর্বি ছিল। মহানবী (সা.)–এর ঘোষক ঘোষণা করেন, নিজেরাও খাও এবং নিজেদের পশুদেরও খাওয়াও, তবে (এখান থেকে) কিছু নিয়ে যাবে না। যা খেতে মন চায় এখানে বসেই খাও।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১২২) (ফতেহ খায়বার, পৃ: ১৪০)

এরপর তৃতীয় দুর্গ হলো যুবায়ের বিন আওয়াম দুর্গ । এই (দুর্গ) জয়ের বিবরণ এভাবে পাওয়া যায় যে, এই দুর্গের নাম ছিল 'কুল্লাহ্' পরবর্তীতে এটি হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-র অধীনে আসে তাই এটি 'যুবায়ের দুর্গ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহুদীরা যখন নায়েম এবং সা'দ বিন মুআয দুর্গ থেকে যুবায়ের বিন আওয়াম দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয় তখন মহানবী (সা.) তাদের অবরোধ করেন। এই দুর্গটি পাহাড়ের চূড়ায় (অবস্থিত) ছিল। মহানবী (সা.) তিনদিন এটি অবরোধ করে রাখেন। একজন ইহুদী, যার নাম ছিল গাযাল, সে এসে বলে, মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলে, হে আবুল কাসেম! (অমুসলমানরা এই উপাধিতেই তাঁকে সম্বোধন করতো) আপনি যদি আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন তাহলে আমি আপনাকে এমন (একটি) কথা বলবো, যার মাধ্যমে আপনি নাতাআ বাসীদের হাত থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে অর্থাৎ, এই দুর্গ দখল করতে পারবেন। এরপর আপনি 'শাক্কবাসীদের' উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবেন, নিশ্চয় শাক্কবাসীরা আপনার প্রতাপের কারণে ইতঃমধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এরপর আপনি অন্য দুর্গ -অভিমুখে যেতে পারবেন। মহানবী (সা.) তার পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। (তখন সেই) ইহুদী বলে, আপনি যদি এভাবে একমাসও দাঁড়িয়ে থাকেন তবুও তাদের কিছু যাবে আসবে না। তাদের মাটির নিচে অনেক সুড়ঙ্গ আছে, তারা রাতের বেলা বেরিয়ে পানি নিয়ে আসে এবং নিজ নিজ দুর্গে ফিরে যায়। তারা আপনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ছে। তবে, আপনারা যদি তাদের পানির উৎস বিচ্ছিন্ন করে দেন তাহলে তারা অস্ত্রসমর্পণ করবে। মহানবী (সা.) তার পেছনে বা সাথে যান এবং ইহুদীদের সুড়ঙ্গগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেন। যখন তাদের পানি সংগ্রহের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন তারা (দুর্গ থেকে) বাইরে বের হয়ে আসে এবং তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়, অর্থাৎ লড়াই শুরু হয়ে যায়। সেদিন মুসলমানদের মধ্য হতে কয়েকজন সাহাবী শহীদ হন এবং ইহুদীদের মধ্য হতে দশজন নিহত হয়, অবশেষে তিনি (সা.) বিজয় লাভ করেন। আর এটি ছিল নাতাআ'র দুর্গগুলোর মধ্যে শেষ দুর্গ। মহানবী (সা.) নাতাআ'তে কাজ সম্পন্ন করার পর 'শাক্ক' এর দুর্গগুলো- অভিমুখে যান। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এটি দুর্গগুলোর তৃতীয় গ্রুপ ছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ:১২২,১২৩) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

এখানে ইহুদী নেতা সালাম বিন মিশকামের মৃত্যুরও উল্লেখ পাওয়া যায়। নাতাআ'র দুর্গগুলোর যুদ্ধে সালাম বিন মিশকামও মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। সালাম ছিল বনু নযীর গোত্রের একজন বড় নেতা এবং ইহুদীদের (প্রধান) সেনাপতি ছিল। কিন্তু সে অসুস্থ ছিল, তাই অন্যান্য ইহুদী নেতার মতো সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। অর্থাৎ, স্বয়ং তরবারি ও তির নিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেনি। তার সাথীরা তাকে কাতিবা অঞ্চলে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেয়, কেননা সেটি অধিক নিরাপদ ছিল। সালাম বিন মিশকাম চির রোগী হওয়া সত্ত্বেও এই পরামর্শ গ্রহণ করেনি, অবশেষে সে নাতাআ'তে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৫)

যদি তার অসুস্থতার ঘটনা সত্য হয় এবং সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ নাও করে থাকে তথাপি তাকে হত্যা করা এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিযোগ্য হতে পারে না, কারণ সে তার সেনাদের যুদ্ধে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করেছিল, সে তাদের সার্বিক তত্ত্বাবধানও করে থাকবে। তাই, এমন যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কোনো সাহাবী তাকেও হত্যা করেন, কারণ সে সেখানেই তাদের সাথে ছিল। সেনাপ্রধানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে আর সেনাপতি নিহত হলে সেনাবাহিনীরও মনোবল ভেঙে যায়। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে হত্যা করাও কোনো আপত্তিযোগ্য বিষয় নয়।

শাক এর উভয় দুর্গের অবরোধ। শাকও দুটি বা তিনটি দুর্গের সমন্বয়ে গঠিত। আর এটির বিজয় সম্পর্কে এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে-

শাক এর দুটি দুর্গ ছিল। শাক এর প্রথম দুর্গ, যার মাধ্যমে তিনি (সা.) সূচনা করেছেন তা ছিল উবাই-এর দুর্গ। মহানবী (সা.) একটি পাহাড়ের চূড়ায় দণ্ডায়মান হন, যার নাম ছিল সামওয়ান। তাতে দাঁড়িয়ে তিনি দুর্গের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করেন। শুরুতে এক ইহুদি সম্মুখ যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানায়। তার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় হযরত হুব্বাব বিন মুনযের বের হন। তারা উভয়ে একে অপরের ওপর আক্রমণ করেন। হযরত হুব্বাব এক আঘাতেই তার ডান হাতের অর্ধেক কেটে ফেলেন। আর তার হত থেকে তরবারি পড়ে যায়। সে পরাজিত হয়ে নিজ দুর্গে ফিরে যাচ্ছিল। হযরত হুব্বাব তার পিছুধাওয়া করেন এবং তার মেরুদণ্ডের মাংশপেশী কেটে ফেলেন তখন সে পড়ে যায় আর হযরত হুব্বাব তাকে হত্যা করেন। এরপর অন্য এক ব্যক্তি বাইরে আসে আর প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান করে? মুসলমানদের মধ্য থেকে জাহাশ পরিবারের এক ব্যক্তি বাহিরে আসে। কিন্তু তিনি মোকাবিলা করতে করতে শহীদ হয়ে যায়। সেই ইহুদি নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে পুনরায় প্রতিপক্ষকে ডাক দেয়। তখন আবু দুজানা তার মোকাবিলা করেন। হযরত আবু দুজানা নিজ শিরস্ত্রাণে লাল কাপড় বেঁধে রেখেছিলেন। সেই ইহুদি অতি দম্ভের সাথে হাঁটছিল। হযরত আবু দুজানা দ্রুত সামনে এগিয়ে গিয়ে তার ওপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ করেন এবং তার পা কেটে ফেলেন এবং তাকে হত্যা করেন। হযরত আবু দুজানা সেই ব্যক্তির সমর সরঞ্জাম, বর্ম ও তরবারি নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) এই জিনিসগুলো হযরত আবু দুজানাকে উপহার দেন। ইহুদিরা এরপর আর যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে পারে নি। এরপর আর কেউ বাইরে আসে নি। তখন মুসলমানরা নারাধ্বনি উচ্চকিত করে পূর্ণ আক্রমণ করে আর দুর্গে প্রবেশ করে। মুসলমানদের মাঝে সর্বাগ্রে ছিলেন হযরত আবু দুজানা। মুসলমানরা এই দুর্গে সাজ সরঞ্জাম, ছাগল এবং খাবার পান। সকল ইহুদি পালিয়ে যায়। তারা দেওয়াল ডিঙিয়ে (এমনভাবে) পালাচ্ছিল যেন তারা ভীতত্রস্ত হরিণ। তারা সবাই শাক এর দ্বিতীয় দুর্গে চলে যায় অর্থাৎ, অতি দ্রুত পলায়ন করে।

মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে তাদের পিছু ধাওয়া করেন আর ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ হয়। ইহুদিরা মুসলমানদের ওপর প্রচণ্ড তিরন্দাজি এবং পাথর নিক্ষেপ করে। ইহুদিদের প্রতিউত্তরে মুসলমানরাও তাদের ওপর একইভাবে তিরন্দাজি করছিল। কিন্তু ইহুদিদের তির মুসলমানদের অধিক ক্ষতি করছিল, কেননা ইহুদিরা তাদের ওপর দুর্গের মিনার থেকে তির নিক্ষেপ করছিল, অর্থাৎ উপরের দিক থেকে তির নিক্ষেপ করছিল, আর মুসলমানরা দুর্গের নীচের দিকে শিবির স্থাপন করেছিল। মহানবী (সা.)-ও মুসলমানদের সাথে ইহুদিদের ওপর তির নিক্ষেপ করছিল। মনে হয় ইহুদিদের লক্ষ্য বিশেষত সেই স্থান ছিল যেখানে মহানবী (সা.) অবস্থান করছিলেন, কেননা সেখানে অনেক বেশি তির বর্ষিত হচ্ছিল। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথেই উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় একটি তির মহানবী (সা.)-এর কাপড়ে এসে লাগে।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (সা.) তির লাগার কারণে আহত হয়ে পড়েন। তির লাগার কারণে তাঁর (সা.) কাপড় ছিঁড়ে যায়। মহানবী (সা.) তির বের করেন। এরপর তিনি এক মুষ্টি কঙ্কর নিয়ে সেই দুর্গের দিকে নিক্ষেপ করেন, যার ফলে তাদের দুর্গ কাঁপতে থাকে। এমনকি মুসলমানরা ইহুদিদের পাকড়াও করে এবং দুর্গ জয় হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ:১২৩)(ফতেহ খায়বার, পৃ: ১৫৬-১৫৭)

এরপর রয়েছে কাতিবার তিনটি দুর্গ। মুসলমানরা এই তিনটি দুর্গেরই অবরোধ করে। এ সম্পর্কে লিখিত আছে যে, মহনবী (সা.) যখন নাতা এবং শাক-এর দুর্গসমূহ জয় করেন তখন ইহুদিরা কাতিবার তিনটি দুর্গ ওয়াতী, সুলালেম এবং কামূস-এ আশ্রয় নেয়। কাতিবার দুর্গ সমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় দুর্গ ছিল কামূস। আর এটি সবচেয়ে সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। ইহুদিরা এই তিনটি দুর্গে দুর্গাবদ্ধ হয়ে যায়। তারা নিজেদের দুর্গ থেকে নীচের দিকে উঁকি পর্যন্ত দিতো না। আর তাদের মধ্য থেকে কেউ দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাতেও বের হতো না। মহানবী (সা.) চৌদ্দ দিন পর্যন্ত এই দুর্গগুলো অবরোধ করে রাখেন। এক পর্যায়ে তিনি (সা.) এই সিদ্ধান্ত নেন যে, তাদের ওপর কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হোক, অর্থাৎ তোপ দ্বারা পাথর নিক্ষেপ করা হোক। ইহুদিরা যখন নিশ্চিৎ পরাজয় দেখতে পায় তখন তারা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব দেয় আর কিনানা বিন আবু হুকায়েক ইহুদিদের মধ্য থেকে শামাখ নামের এক ব্যক্তিকে মহানবী (সা.)-এর কাছে এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করে যে, আমি আপনার সাথে আলোচনায় বসতে চাই। মহানবী (সা.) অনুমতি প্রদান করেন। কিনানা বিন আবু হুকায়েক দুর্গ থেকে নীচে নামে আর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) -এর সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে। তিনি (সা.) সাহাবীদের প্রেরণ করেন আর তারা তাদের সম্পত্তি হস্তগত করে। অর্থাৎ সাহাবীরা তাদের সম্পত্তি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন। এই দুর্গসমূহ থেকে ১০০ বর্ম, ৪০০ তরবারি, ১০০০ বর্শা, তূণীসহ ৫০০ ধনুক হস্তগত হয়।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ:১৩১) (সীরাতুন নববীয়াহ লি ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৭৬)

কামুস দুর্গ জয় সম্পর্কে কতিপয় বিবিধ রেওয়ায়েতও রয়েছে। যেমন কামুস দুর্গ জয় হওয়া সম্পর্কে জীবনী গ্রন্থসমূহে এটিও লিখিত আছে যে, এটি ২০ দিন পর্যন্ত অবরোধ করা হয়েছে আর অবশেষে ইহুদিদের সাথে

যুগ ইমামের বাণী

শাহাদতের প্রাথমিক ধাপ হল খোদার পথে অবিচল ও অটল থাকা। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

দোয়াপ্রার্থী: Late Younus Gazi From-Raju Gazi
Sb. Ghutiari Shareef, 24 PGS (s)

কঠিন লড়াইয়ের পর হযরত আলীর হাতে এই দুর্গ বিজয় হয়। অধিকন্তু এই দুর্গের অবরোধ সম্পর্কে কতক জীবনীকার বিভিন্ন গ্রন্থে সেসব ঘটনাই উল্লেখ করেছেন যেগুলো নায়েম দুর্গ বিজয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য লেখকরা বর্ণনা করেছে।

(শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৫) (সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯২-৩৯৩) ((সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড,পৃ:১২৬)

যাইহোক এই দুর্গ জয় হয়ে যায়। এরপর ইহুদিদের সাথে একটি চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত গুলো নিম্নরূপ

১. ইহুদিদের জন্য আবশ্যক হবে তারা যেন সমস্ত দুর্গ খালি করে দেয় আর নিজেদের সমস্ত যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্র সেখানেই ছেড়ে দেয় যেন ইসলামী বাহিনী তা দখল করে নিতে পারে আর তা মুসলমানদের সম্পত্তির একটি অংশ হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের অস্ত্র যেন মুসলমানদের হাতে তুলে দেয় বর্তমান যুগে যেটিকে আত্মসমর্পণ বলা হয়।

২. আলোচনা অনুযায়ী মহানবী (সা.) ইহুদিদের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান এবং তাদের নারী ও শিশুদের দাস-দাসী না বানানোর অঙ্গীকার করবেন। অর্থাৎ মহানবী (সা.) ইহুদিদের প্রাণভিক্ষা দেবেন, তাদের হত্যা করা হবে না এবং তাদের স্ত্রী সন্তানদেরও সুরক্ষা দেয়া হবে।

৩. তৃতীয় শর্ত ছিল এই যে, ইহুদিদের জন্য আবশ্যক হবে খায়বার থেকে সিরিয়ায় দেশান্তরিত হবে

৪. চতুর্থ শর্ত ছিল এই যে, খায়বার ছেড়ে যাওয়ার সময় নিজেদের বাহনগুলোতে যতটা ধনসম্পদবহন করতে পারে তা তারা নিয়ে যেতে পারবে আর মুসলমানরা তাদেরকে বাধা দেবে না ।

৫. পঞ্চম শর্ত হলো এই যে, ইহুদিরা এই অঙ্গীকার করবে যে, তারা সমস্ত গুপ্ত ধনভাণ্ডার সম্পর্কে মুসলমানদের অবগত করবে এবং সেগুলো বিজয়ীদের হাতে তুলে দেবে।

৬. ষষ্ঠ শর্ত হলো, ইহুদিরা এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, যদি তারা এই সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে অথবা এমন কোনো কিছু গোপন করে যা প্রকাশ করা আবশ্যক, তাহলে মুসলমানদের ওপর কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না আর মুসলমানরা এই চুক্তির সমস্ত শর্ত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং ইহুদিদের সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততি মুসলমানদের জন্য হালাল হবে।

(ফতেহ খায়বার, পৃ: ১৮৫-১৮৬)

খায়বার বিজয়ের পর ইহুদীদের খায়বারে অবস্থান করা এবং খায়বারে ইহুদীদের খেতখামার ও বাগবাগিচা থেকে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক দেবারও উল্লেখ পাওয়া যায়। লেখা আছে, চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীদের সিরিয়ার দিকে দেশান্তরিত হবার কথা ছিল কিন্তু ইহুদীরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, তাদেরকে যেন খায়বারে থাকার অনুমতি দেওয়া হয় যেন তারা সেখানে চাষাবাদ ও খেতখামার করতে পারে কেননা তারা এ বিষয়ে বেশ অভিজ্ঞ। মহানবী (সা.) তাদের নিবেদন কবুল করে তাদেরকে খায়বারে থাকার অনুমতি প্রদান করেন, যাতে তারা চাষবাসের কাজ করতে পারে আর এর বিপরীতে (বাৎসরিক) উৎপাদনের অর্ধেক পেতে পারে। তাদের সাথে [তিনি (সা.)] খুবই দয়ার্দ্র আচরণ করেন।সহীহ বুখারীর রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) ইহুদীদেরকে খায়বার দিয়ে দেন যেন তারা এখানে কাজ করতে পারে এবং চাষাবাদ করতে পারে আর তাদের জন্য সেখানকার উৎপাদিত ফসলাদির অর্ধেক হবে বলে নির্ধারিত হয়।

(ফতেহ খায়বার, পৃ:৫৭) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৪৮)

খায়বারে শাহাদাত বরণকারী সাহাবীর সংখ্যা ১৭জন। তাদের নাম যথাক্রমে: হযরত রাবিয়্যা বিন আকসাম, সাকফ বিন আমর, হযরত রিফা বিন মাসরুম, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়্যা, হযরত মাহমুদ বিন মাসলামা, হযরত আবু যিয়াহ বিন নু'মান, হযরত হারেস বিন হাতেব, হযরত আদী বিন মুররাহ, হযরত অওস বিন হুবায়েব, হযরত হুনায়েফ বিন আওয়ায়েল, হযরত মাসউদ বিন সা'দ, হযরত বিশর বিন বারাআ, হযরত ফুযায়েল বিন নু'মান, হযরত আমের বিন আকওয়া, হযরত উম্মারা বিন উকবা আর হাবশি গোলাম হযরত ইয়াসার, আশজা' গোত্রের এক ব্যক্তি যার নাম উল্লেখ নেই।

ইহুদীদের মাঝ থেকে ৯৩জন সদস্য এই যুদ্ধে নিহত হয় যাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন যথাক্রমে: হারেস, আবু যায়নাব, মারহাব, উসায়ের, ইয়াসের, আমের কিনানা, আবু হুকায়েক।

(তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮২) (কিতাবুল মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৬০) (আমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৩) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ :২৪৬৪)

খায়বারের পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। এর মাঝে একটি হলো কিনানা বিন রাবি-এর হত্যার ঘটনা। ইতিহাস ও জীবনচরিতের পুস্তকগুলোতে উল্লিখিত আছে যে, খায়বার বিজয়ের পর ইহুদীদের সাথে যখন চুক্তি হয়ে যায়, এরপর লোকেরা কিনানা এবং তার ভাই রাবি'কে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসে। কিননা পুরো খায়বারের ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল এবং হযরত সাফিয়্যার স্বামী ছিল আর রাবি' তার চাচাতো ভাই ছিল। কিনানা'র কাছে ইহুদী গোত্র বনু নাযীর-এর সর্দার হুয়ী বিন আখতাব-এর ধনভাণ্ডার ছিল যার ভিতরে সোনারুপার অলংকার ইত্যাদি ছিল আর সে এসব অলংকার আরববাসীদেরকে তাদের বিবাহশাদীর অনুষ্ঠানে ভাড়া হিসেবে দিতো। তাদের উভয়কে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের সেই ধনভাণ্ডার কোথায়। তারা বলে, আমরা যখন মদীনা থেকে বের হই, এরপর তা ধীরে ধীরে ব্যয় হয়ে গেছে।অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা বলে, হে আবু কাসেম! [মহানবী (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলে] আমরা সেগুলো আমাদের যুদ্ধের জন্য ব্যয় করে ফেলেছি আর সেগুলোর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আমরা সেই সম্পদ এই দিনের জন্যই একত্র করেছিলাম। মহানবী (সা.) তাদেরকে বললেন, মদীনা থেকে বের হওয়ার যুগ সুদূর অতীতের কোন যুগ নয় যে, সেই সমস্ত সম্পদ ব্যয় হয়ে যাবে। তখন তারা উভয়ে কসম খেয়ে বলে যে, তাদের কাছে কোনো ধনসম্পদ নেই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের কাছে থেকে যদি সেই সম্পদ উদ্ধার হয় তাহলে তোমাদের নিরাপত্তার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোনোভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন না । তারা বলে, ঠিক আছে। তখন মহানবী (সা.) এ বিষয়ে হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত আলী এবং হযরত যুবায়ের (রা.)-কে সাক্ষী রাখেন। তখন এক ইহুদী দণ্ডায়মান হয় আর সে কিনানার কাছে গিয়ে বলে, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের কাছে যা চাচ্ছেন, তা যদি তোমাদের কাছে থেকে থাকে তাহলে তাঁকে তা দিয়ে দাও। তাহলেতোমাদের জীবন রক্ষা পাবে। নয়তো খোদার কসম! সে অবশ্যই তা বের করে ছাড়বে। ইবনে হুকায়েক তাকে ভর্ৎসনা করে সেই ইহুদি পৃথক হয়ে একদিকে চলে যায়। এটি ইতিহাসের গ্রন্থে লিখিত আছে।

(তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৬) (তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১৫) (কিতাবুল মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে বললেন, তোমরা যদি আমার কাছ থেকে কোন বিষয় গোপন কর আর আমি যদি পরবর্তীতে তা জানতে পারি তাহলে তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদেরকে এ কারণে হত্যা করা বৈধ মনে করব। তারা বলল, ঠিক আছে। ইতিহাসের একটি গ্রন্থে এই গুপ্তধন সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এক আনসার সাহাবীকে ডেকে বললেন, তুমি অমুক অমুক জায়গায় যাও, এরপর সেখানের খেজুরগুলোর কাছে যাবে। এরপর ডান দিক থেকে অথবা বাম দিক থেকে যে খেজুরগুলো উঁচু - সেগুলো ভালোভাবে ঘেঁটে দেখবে, সেখানে যা-ই পাবে, সেগুলো আমার কাছে নিয়ে আসবে। [অর্থাৎ সেগুলোর নিচে কী আছে- দেখবে]। উক্ত গুপ্তধনের দাম নিরূপণ করা হলে তার মূল্য দাঁড়ায় দশ হাজার দিনার। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তাদের উভয়কে হত্যা করা হয় আর তাদের পরিবারবর্গকে বন্দি করা হয়- এ হলো একটি রেওয়ায়েত।

একটি রেওয়ায়াতে এভাবে বর্ণীত হয়েছে [কতটুকু সঠিক তা পরে নির্ণয় হবে]। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এর কাছে কিনানাকে উপস্থিত করা হল আর তার কাছে বনু নযীরের গুপ্তধন ছিল। তাকে গুপ্তধন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে অস্বীকার করে।

(তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৬) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৬)

পুনরায় মহানবী (সা.) -এর কাছে এক ইহুদি ব্যাক্তিকে উপস্থিত করা হল যার নাম ছিল সালাবা। কোন কোন রওয়ায়েত অনুসারে, সায়া বিন সাল্লাম বিন আবু হুকায়ককে ডেকে জিজ্ঞেস করেন। সে মহানবী (সা.) কে বলে, আমি কিনানাকে প্রত্যেকদিন সকালে সেই ধ্বংসস্তুপের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখতাম। মহানবী (সা.) সালাবার সাথে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম এবং কতক মুসলমানকে প্রেরণ করলেন, সালাবা যে স্থানের

যুগ খলীফার বাণী

কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একটিই পথ- আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নতজানু হও। (খুতবা, জুমআ, ১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

কথা বলেছিল সেখানে খনন করা হলে সেখান থেকে গুপ্তধন বেরিয়ে আসে।

অপর আরেকটি রওয়ায়েতে রয়েছে যে, কিছু গুপ্তধন পাওয়া যায় কিন্তু অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নি। কিনানাও তা বলতে অস্বীকার করে। তখন মহানবী (সা.) হযরত যুবায়েরকে নির্দেশ দিলেন যে, কিনানাকে শাস্তি প্রদান করো। হযরত যুবায়ের চাকমাকের (এমন শক্ত পাথর যার ওপর লোহা দ্বারা আঘাত করলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গা নির্গত হয়) পাথর নিয়ে আসে আর তার বুকে আঘাত করা শুরু করলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গা বের হয়। আর যখন সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে যায় তখন সে অবশিষ্ট গুপ্তধন সম্পর্কে অবহিত করে। এরপর মহানবী (সা.) মৃত্যদণ্ড দেয়ার জন্য কিনানাকে মুহাম্মদ বিন মাসলামার সোপর্দ করেন। অতএব মুহাম্মদ বিন মাসলামা তার ভাই মাহমুদ বিন মাসলামা যার ওপর চাক্কি ফেলার কারণে তিনি শহীদ হয়েছিলেন, তার প্রতিশোধস্বরূপ কিনানাকে হত্যা করেন।

যাইহোক, হত্যা তো করেছিল কিন্তু পুরোবিষয়টির বিবরণ যেভাবে দেওয়া হয় তা শুনলে এটিকে মহানবী (সা.)-এর আদর্শের পরিপন্থী বলে মনে হয়। কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাদের উভয় ভাইকে হত্যা করা হয়েছিল। আর অপর এক রেওয়ায়োত অনুযায়ী কিনানাকে মুহাম্মদ বিন মাসলামা হত্যা করেছিলেন। আর তার অপর এক ভাই বিশর বিন বারা-এর পরিবারের লোকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল। আর তাকেও বিশর বিন বারা-এর প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করা হয়। মাহানবী (সা.) তাদের সম্পদকে হালাল ঘোষণা করলেন (তথা বাজেয়াপ্ত করলেন) আর তাদের সন্তানদের বন্দি করলেন।

এ রেওয়ায়াতসমূহ ইতিহাস এবং জীবনীসংক্রান্ত বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য বিদ্যমান। যেমন, তারিখে তাবরি, তারিখুল খামিস, তাবকাত ইবনে সা'দ, কিতাবুল মাগাযী (ওয়াকদী প্রণীত), সীরাতে ইবনে হিশাম, সীরাত ইবনে ইসহাক, সীরাতে হালবিয়া, যুরকানী ইত্যাদি। কিনানাকে উক্ত কারণে হত্যার কথা হাদীস গ্রন্থ সুনানে আবু দাউদেও বর্ণিত আছে কিন্তু কিনানাকে হত্যার ভিন্ন কারণ এবং রেওয়ায়াতও বিদ্যমান, যা থেকে বুঝা যায় যে তাকে গুপ্তধন চিহ্নিত না করার কারণে হত্যা করা হয় নি।

(সীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬২) (কিতাবুল মাগাযি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪০) (শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৬৫) (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৬৯৮) (আমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৫) (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল খিরাজ ও আলফা..... , হাদীস-৩০০৬)

যাহোক, খায়বারের এই ঘটনাটি প্রাচ্যবিদরাও তাদের পুস্তকে বর্ণনা করেছে এবং এরপর আপত্তিকারীরা তাদের স্বভাব অনুযায়ী ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় সত্ত্বার ওপর আপত্তি উত্থাপন করেছে। তারা দেখাতে চেয়েছিলো যেন মহানবী (সা.) ধন সম্পদের প্রতি লালয়িত ছিলেন বা নাউযুবিল্লাহ তিনি কতটা অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা প্রর্দশন করতেন। আর আপত্তিকারীরা বিন্দু পরিমাণ বিবেক না খাটিয়ে (আপত্তি করেছে), কেননা মহানবী (সা.) এর জীবনচরিত ছিলো সবার জন্য উন্মুক্ত পুস্তকের ন্যায়; যিনি যুদ্ধ শুরুর পূর্বে সবাইকে নির্দেশ দিতেন যে, সাবধান! (যুদ্ধের সময়) কোন শিশু, নারীকে হত্যা করবে না, এমনকি অকারণে গাছও যেন কাটা না হয়।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ,হাদীস-৩০১৫) সুনান আল কাবীর, লিলবাইহাকি, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১৫৪)

যিনি পশুদেরকেও কোন কষ্টে দেখতে পারতেন না তিনি কিভাবে মানুষের প্রতি অত্যাচার ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারেন।

একইভাবে, [মহানবী (সা.) এর বিরুদ্ধে] মালে গণিমত অর্জনের জন্য যুদ্ধ করার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ খায়বারের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগের পূর্বে মহানবী (সা.) ঘোষণা দিয়েছিলেন, যারা মালেগণিমত আশা বা আকাঙ্খা রয়েছে তারা আমাদের সাথে যেতে পারবে না। [যার বিস্তারিত ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।]

যে নবীর (সা.) দৃষ্টান্ত ও আদর্শ এমন তাঁর সম্পর্কে যখন এ ধরণের রেওয়ায়েত সামনে আসে তখন ন্যায়-নিষ্ঠার দাবী হচ্ছে, আমরা যেন এই রেওয়ায়েতগুলোকে গভীরভাবে পরখ করি এবং পর্যবেক্ষণ করি। প্রথমত প্রতিটি হাদীস ও রেওয়ায়েতকে যথাসম্ভব সম্মান করা আর সেগুলোর বিষয়বস্তুর যতটুকু সম্ভব ব্যাখ্যা করা উচিত। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পূতঃপবিত্র এবং তাঁর (সা.) সম্মান সর্বাগ্রে। মহানবী (সা.) তো ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়নতার মুর্তপ্রতিক ছিলেন। সমগ্র জগতের জন্য 'রাহমত ছিলেন। এর পরিপন্থি কোন রেওয়ায়েত গ্রহণযোগ্য নয়। আবার ঐতিহাসিকগণ ও মহানবী (সা.) -এর জীবনচরিত রচয়িতাগণ বর্ণনা করেছেন, হাজার হাজার (বরং) অসংখ্য হাদীস ও রেওয়ায়েত পরের লোকেরা নিজেরাই বানিয়েছে। আর এটাও স্বীকৃত বিষয় যে ইহুদীরাও এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত ছিল, তারা মিথ্যা রেওয়ায়েত তৈরি করতো।

কিনানা এবং তার ভাইয়ের হত্যাকান্ড সংক্রান্ত ঘটনাটি আমাদের গবেষক টিম (রিসার্চ টিম) গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছে রেওয়াতের আলোকে যুক্তি দিয়েছে এবং আপত্তিকারীরা যে আপত্তি করেছে তার খণ্ডন করে ছে। [খুবই ভালো উত্তর দিয়েছেন]। তারা বলে, এই ঘটনার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায়, বর্ণনাকারীরা তাদের বর্ণনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল করেছে। তারা না বুঝে বিভিন্ন বিষয় গুলিয়ে ফেলেছে। যদি এমন কোন ঘটনা ঘটেও থাকে তবে একটি ছোট্ট ঘটনাকে নেতিবাচকভাবে অতিরঞ্জিতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ইহুদীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন এবং সময় সব ধরণের শর্ত নির্ধারণের পর চুক্তিনামা লেখা হয় এরপর গুপ্ত ধনভান্ডারের দাবী করা বাহ্য দৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হয়। কেননা, চুক্তি অনুসারে ইহুদীদের খায়বারের ভূমি ছাড়া সকল জিনিসের মালিকানাসত্ত্বের অবসান ঘটে। অতঃপর রেওয়ায়েত অনুযায়ী যদি সেই গুপ্তধন পাওয়া গিয়ে থাকে তবে তা গেল কোথায়? খায়বারে যুদ্ধলব্ধ যে সকল সম্পদ বন্টন করা হয়েছিল তার সমস্ত বিবরণ ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যথা- ঘি, চর্বি, খেজুর, কাপড়, মালপত্র, গবাদী পশু, বর্শা, তরবারি, তীর, ঢাল ইত্যাদি। কিন্তু কোথাও অমুক এত স্বর্ণ, রৌপ্য বা হীরার মনিমানিক্য পেয়েছে বলে উল্লেখ নেই বরং এর উল্টোটা লেখা দেখা যায় যে, খায়বারের যুদ্ধলব্ধ সম্পদে কোন স্বর্ণ -রৌপ্য পাওয়া যায়নি। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

গুপ্তধনের অনুসন্ধানের জন্য যে রেওয়ায়েতগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোতে গভীর মতভেদ ও স্ববিরোধ রয়েছে। কোন বর্ণনায় কেনানাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, (আবার) অন্য (বর্ণনায়) কিনানা ও তার ভাই উভয়কেই (জিজ্ঞাসাবাদের জন্য) ডাকা হয়েছিল, কোন বর্ণনায় তাদের সাথে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজন ইহুদীকে ডাকা হয় (আবার) কোন বর্ণনায় হুইয়ের চাচাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। অতএব এসব অনুসন্ধানের পর যদি শাস্তি দেওয়ার থাকতো তাহলে অনেকেই শাস্তিযোগ্য হতো। কিন্তু বর্ণনা অনুযায়ী শুধুমাত্র দু'জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ কেনানা আর তার ভাইকে। কিছু রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুধুমাত্র কেনানাকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। বুখারিতে লিখিত আছে যে, যখন হযরত উমর (রা.) নিজ খেলাফতকালে খায়বার থেকে ইহুদিদের দেশান্তরিত করার সংকল্প করেন সেই সময় তার (রা.) নিকট আবুল হুকাইকের এক ছেলে আসে। বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার লিখেন, কেনানার এই ভাই হযরত উমরের (রা.) সময়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিল আর দেশান্তরিত হওয়া পর্যন্ত খায়বারে অবস্থান করছিল। তাই তার ভাইয়ের হত্যার বিষয়টিও মিথ্যা সাব্যস্ত হলো। কিছু জীবনীকার বুখারীর এই বর্ণনা থেকে এই ব্যাখ্যা করেন যে, শুধুমাত্র কেনানাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

(ফতহুল বারি শারাহ সহীহ বুখারী, হাদীস-২৭৩০,৫ম খণ্ড, পৃ: ৪১১) (সীরাতুন্নবী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৩) (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪২৩৪)

যাইহোক এমন সব কথা যে সব রওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ ধন-ভান্ডার উদ্ধারের জন্য দৈহিক শাস্তির দেওয়ার যে কথা রয়েছে সেগুলো স্ববিরোধের কারণে সন্দেহজনক প্রমাণিত হয়। সত্যিকার অর্থে এসব রেওয়ায়েতই ভ্রান্ত। তাই একজন প্রসিদ্ধ জীবনীকার আল্লামা শিবলি নোমানী লিখেন, খায়বারের ঘটনাবলিতে জীবনচরিত রচয়িতারা অনেক বড় ভ্রান্ত একটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। বেশিরভাগ পুস্তকে তা উদ্ধৃত হয়ে তা পুস্তকের অংশ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ তা মেনে নেয়া হয়েছে এবং রেওয়ায়েত সমূহের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। প্রথমত মহানবী (সা.) এই শর্তে ইহুদিদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তারা কোনো কিছু গোপন করবে না। কিন্তু কিনানা বিন রাবি ধনভান্ডারের কথা প্রকাশ করতে

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (s)

যুগ ইমামের বাণী

যার মধ্যে ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Bibi & Jahanara Bibi From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (s)

অস্বীকার করে। তখন তিনি যুবায়েরকে গুপ্তধন উদ্ধারের জন্য কঠোরতা প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। হযরত যুবায়ের চকমকি পাথর দ্বারা তার বুকে আঘাত করতে থাকেন এবং তাকে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পোঁছে দেন। পরিশেষে মহানবী (সা.) কিনানাকে হত্যা করিয়েছেন আর সকল ইহুদি শিশু ও নারীদেরকে দাস বানানো হয়। এই ঘটনার এই দিকটি সঠিক যে কেনানাকে হত্যা করা হয়েছিল, কিন্তু তার কারণ এটি ছিল না যে সে ধনভান্ডারের কথা বলতে অস্বীকার করেছিল, বরং এর কারণ ছিল কেনানা মাহমুদ বিন মাসলামাকে হত্যা করেছিল। তাবরীতে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে আর তাহলো মহানবী (সা.) কিনানাকে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার (রা.) নিকট তুলে দেন আর তিনি তার ভাই মাহমুদ বিন মাসলামার হত্যার প্রতিশোধে তাকেহত্যা করেন। এই রেওয়ায়েত তাবরী এবং ইবনে হিশাম উভয়ে ইবনে ইসহাক এর বরাতে বর্ণনা করেছে। কিন্তু ইবনে ইসহাক উপরের কোনো বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করে নি। মুহাদ্দিসগণ হাদীসের রওয়ায়েতকারী সংক্রান্ত রিজালের পুস্তকের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, ইবনে ইসহাক ইহুদিদের কাছ থেকে মহানবী (সা.) এর যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। (অনেক ঘটনা তিনি ইহুদিদের কাছ থেকে নিয়েছেন।) এই রেওয়ায়েতও তিনি ইহুদিদের কাছ থেকে নিয়েছেন বলে মনে করা উচিত। আর ইহুদিরা কখনও সঠিক বিষয় বলবে না। একারণেই ইবনে ইসহাক এসব বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখ করেন নি। গুপ্তধনের কথা প্রকাশ করার জন্য কারও বুকে আগুন জ্বালিয়ে নির্যাতন করা রহমতুল লীল আলামীনের মর্যাদা পরিপন্থি। যে ব্যক্তি খাবারে বিষ প্রয়োগকারীর প্রতিশোধ নেন না, তাকে শাস্তি দেন না, তিনি সামান্য কিছু পয়সার জন্য কাউকে আগুনে জ্বালানোর নির্দেশ দিতে পারেন? আসল কথা হলো, কেনানাকে এই শর্তে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল যে, কোনো ধরনের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না এবং মিথ্যা বলবে না। বরং রেওয়ায়েত অনুসারে সে এটিও অঙ্গীকার করে যে, সে যদি এই (শর্তের) বিপরীতে কিছু করে তাহলে হত্যা যোগ্য বলে গণ্য হবে। কেনানা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে যে কারণে তাকে প্রদত্ত নিরাপত্তার অঙ্গীকার আর বহাল থাকলো না। কেনানা মাহমু দ বিন মাসলামাকে হত্যা করেছিলো যার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথমে হয়তোবা তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হতো কিন্তু অন্যত্র সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল যে কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

(সীরাতুন নবী (সা.), প্রণেতা- শিবলী নুমানী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৪-২৮৫)

বর্তমান সময়ের একজন আহমদী লেখক সৈয়্যদ বারকাত সাহেব নিজ "রসূল আকরাম (সা.) এবং হিজাযের ইহুদি" পুস্তকে লিখেন, ইবনে ইসহাক কোনো সনদ উল্লেখ না করেই একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন আর এটি স্পষ্টতই ভ্রান্ত ছিল। প্রথমত শাস্তি দেওয়া তাও আগুনের শাস্তি প্রদান ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি।দ্বিতীয়ত খায়বারের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ক্ষেত্রে উদ্ধারকৃত এই সম্পদ বণ্টনের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।আর এ ধনসম্পদ বায়তুল মালে জমা হবার কোনো রেওয়ায়েতও বিদ্যমান নাই। কেবল ইবনে ইসহাকই নয় বরং অন্যান্য পুরানো উৎসের মাঝেও খায়বারের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে নগদ অর্থ, সোনা-রূপা কিংবা এ ধরনের অন্যান্য মূল্যবান জিনিসের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সকল রেওয়ায়েত বিভিন্ন জিনিসপত্র, কাপড় কিংবা যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে। হযরত আবু হুরায়রা- যিনি খায়বারের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন তিনি বলতেন, আমরা খায়বার তো জয় করে ফেলেছি, কিন্তু যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মধ্যে আমরা সোনা-রূপা পাই নি।

(রসুলে আকরাম অউর ইহুদী হিজায, পৃ: ১৬২-১৬৩)

সার কথা হলো, কিনানা বিন রাবিয়াহ খুন হয়েছে, কিন্তু তার খুন হওয়ার কারণ ছিল একজন মুসলমান সেনাপতিকে হত্যা করা, যার কিসাস (তথা প্রতিশোধ) হিসেবে সে নিজে খুন হয়।অতএব এই হলো মূল ঘটনা।

এই ঘটনা আরো বিস্তারিত রয়েছে। এখানে এসব ঘটনার মাঝে একজন ইহুদী মহিলার উল্লেখ রয়েছে যে কি-না মহানবী (সা.)-কে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করে, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সুরক্ষিত রাখেন। এটি যেহেতু বিশদ ঘটনা তাই এর বিস্তারিত বর্ণনা আগামীতে করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

এখন আমি একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই আর তার গায়েবানা জানাযাও পড়াবো। মাস্টার মনসূর আহমদ কাহলুন, পিতা শরীফ আহমদ কাহলুন সাহেবের । সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতে থাকতেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী চৌধুরী সর্দার খান (রা.)-এর পৌত্র ছিলেন। রাবওয়াতে শিক্ষাদীক্ষা অর্জন করেন, শৈশব থেকে ধর্মসেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। সিন্ধু'র বশিরাবাদ তালিমুল ইসলাম হাইস্কুল থেকে চাকরি জীবন আরম্ভ করেন। প্রায় ৩৪ বছর শিক্ষকতা পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। বশিরাবাদেও তিনি সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদও ছিলেন। জামা'তের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। জুবিলী ফান্ডে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবেও তিনি হায়দ্রাবাদে ১৮ বছর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর ১৩ বছর হায়দ্রাবাদের জেলা আমীর এবং স্থানীয় আমীর হিসাবেও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি অফিস শেষ করে সোজা মসজিদে চলে আসতেন এবং সেখানে সকল কাজ করতেন। আর মাগরিবের নামাযের পর বাড়িতে যেতেন কিংবা কখনো কখনো এর চেয়েও বেশি সময় লেগে যেত।

খিলাফতের সাথে অগাধ ভালবাসার সম্পর্ক ছিল, প্রত্যেক আহ্বানে সাড়া প্রদানকারী, গরিবের লালকারী, অতিথিপরায়ণ, সহানুভূতিশীল ও উদার ছিলেন। অনেক আত্মীয়স্বজনকে নিজের বাড়িতে রেখে পড়ালেখা করান। তার ছাত্রদের মাঝে মুরব্বীরাও আছে, ডাক্তার আছে, ইঞ্জিনিয়ারও আছে- যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে। মরহুম মূসী ছিলেন। তার উত্তরসূরিদের মাঝে স্ত্রী ছাড়া একজন মেয়ে এবং পাঁচজন ছেলে আছে।

এখানে যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেবের অফিসের কর্মী মোবাশ্বের আহমদ গোন্দল সাহেবের ভায়রা ভাই ছিলেন তিনি।

তার ছেলে উসামা বলেন, আমি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকে আমার পিতার মসজিদ ও জামা'তের সাথে এক গভীর সম্পর্ক দেখতে পেয়েছি। মসজিদে না যাওয়ার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। (জামা'তের) অফিসে নিয়মিত যেতেন। কোনো জরুরি কারণ ছাড়া তিনি কখনো অফিসে অনুপস্থিত থাকতেনা আর জামা'তের সদস্যরাও জানত যে, তাকে অফিসে না হয় মসজিদে পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় মেহমানদের অনেক সম্মান প্রদর্শন করতেন, সেবা প্রদান করতেন। কিছুকাল পূর্বে পরিস্থিতির কারণেতিনি অস্ট্রেলিয়া চলে যান। এখানে আসার পরও জামা'তের সেবা করতে থাকেন এবং প্রত্যেক আর্থিক তাহরীকে কেবল অস্ট্রেলিয়াতেই নয়, বরং পাকিস্তানেও অংশগ্রহণ করতেন। অস্ট্রে লিয়াতেও নিজের পরিচিতির গণ্ডি বিস্তৃত করেন। অনেক দ্রুত মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন। অস্ট্রেলিয়াতে স্থানীয় জামা'তের সেক্রেটারি তালিমুল কুরআন ছিলেন এবং সেক্রেটারি তরবিয়ত হিসাবেও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অনেক বিনয়ী এবং সেবাপরায়ন মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও মার্জনার আচরণ করুন। তাদের সন্তানসন্ততিকেও এসব পুণ্য অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫)

****

রোযার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

" আমাদের দেহে দৈনিক যে রূহানী বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয়, ত দূর করার জন্য আরেকটি ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য তিনি দৈনিক পাঁচ বারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্য রমযানে এক মাসের রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়াতেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা'লা তার সামনে এলেও তাঁকে সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারালে তার অত্যন্ত নিকটাত্মীয় সম্মুখে দাঁড়ালেও সে তাকে চিনতে পারে না। অনেকে মনে করে, তারা রোযা রেখে খোদার বড়ই উপকার করেছে। এরূপ মনে করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। চিকিৎসক যখন কোন রুগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করলে যদি সে রুগী মনে করে যে সে রক্ত দিয়ে ডাক্তারের বড়ই উপকার করেছে তা হলে তার অপেক্ষা বড় মূর্খ আর কে আছে? ঔষধ যতই তিক্ত হোক তা রুগীর জন্য কল্যাণজনক। তদ্রুপ যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তা'লার কোন উপকার করে না, বরং এটা তার উপর খোদার অনুগ্রহ যে তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এ দিনগুলির যত বেশি সদ্ব্যবহার করব, আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে যেগুলি ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।"

(আল-ফযল, ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

অতিথিকে গৃহের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বিদায় জানানোও সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত। (সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun, From Mirza Enayetulla Sb Harhari, Murshidabad

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর দ্বারা জ্ঞান ও ধর্ম জগতের এমন সব কাজ নিয়েছেন যে, বড় বড় শিক্ষিত ব্যক্তিরাও তাঁর সামনে পাঠশালার শিশু মনে হয়। তাঁর বাহান্ন বছরের খিলাফত এর জলজ্যান্ত উদাহরণ।

আজ পূর্বের চেয়ে অধিক মুসলিম বিশ্ব এবং আরব বিশ্বের এদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন যে, শুধু স্লোগান দেওয়া এবং মিটিং করার মাধ্যমে কাজ হবে না, বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

"মুসলমানদের উচিত নিজেদের ভুল থেকে তওবা করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে মনোযোগী হওয়া এবং ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করা এর বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং অন্যদের সচেতন করা, যাতে সেই কষ্ট ও পশ্চাৎপদতার মুসলমানরা সম্মুখীন তা দূর হয়। যদি ধর্মের জন্য তারা তবলীগ না করে, যদি আল্লাহ্র নির্দেশের অধীনে তারা এই অতুলনীয় শিক্ষাকে জগদ্বাসীর সামনে উপস্থাপন না করে, বাস্তবে তো এটিই হয়েছে যে, প্রকৃত ইসলামকে তারা কখনো উপস্থাপন করে নি, তাহলে এখন অন্ততপক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হলেও কিছুটাচেষ্টা উচিত। জীবিত থাকতে হলে তার জন্যই কিছু চেষ্টা করা উচিত। কারণ তাদের জীবন এবং ইসলামের তবলীগ দুটো অঙ্গাঙ্গী জড়িত হয়ে । "

ধর্মীয় মতানৈক্যের বিষয়টিকে এক পাশে রেখে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখা যায়, মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব সাহিত্যের জগতে যে কাজ করেছেন তা ব্যাপকতা ও কল্যাণ প্রসারের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য এবং রাজনীতিতে তার জামাতকে সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি চালানের ক্ষেত্রে তিনি যেই কর্মপন্থার সূচনা করে নিজ নেতৃত্বে সেটিকে নিজ সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়েছেন তা প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ মুসলিম এবং সত্যসচেতন ব্যক্তির প্রশংসা আদায় করে। এক প্রজন্ম তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাক্ষী। (সিয়াসত পত্রিকা)

তফসীরে কবীর প্রথমে পুরনো ১০খন্ডে ছিল, এখন এতে আরো কিছু যুক্ত করা হয়েছে তার নোটের আলোকে যা নতুনভাবে ১৫খণ্ডে ছাপা হয়েছে। এতে আরো অনেকবিষয় স্ববিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আরো কিছু সূরার নোট হস্তগত, এগুলো যাচাই করা হচ্ছে। সম্ভবত যখন এগুলো ছাপা হবে তখন এটির ৩০ খণ্ডে সামনে আসবে। কেননা এগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৩০হাজার।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (২১ তবলীগ,, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গতকাল ছিল ২০শে ফেব্রুয়ারি। এই দিনটি (আমাদের) জামা'তে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সুপরিচিত। এই দিনে বা এই প্রেক্ষিতে এর নিকটবর্তী দিনগুলোতে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জামা'তগুলোতেসভাও হয়ে থাকে। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ(আ.)-এর একটি দীর্ঘ ভবিষ্যদ্বাণী যাতে একজন পুত্রের জন্ম এবং তার বৈশিষ্ট্যাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ সালে একটি বিজ্ঞপ্তি আকারে তা প্রকাশিত হয়।এই ভবিষ্যদ্বাণীতে সেই পুত্রের বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে ঐশীবাণীর একটি অংশ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান হবেন। অতঃপর আরও বলা হয়েছে, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে (তাকে) পরিপূর্ণ করা হবে।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৪৭)

আল্লাহ্ তা'লা সে অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে একজন পুত্র দান করেন যিনি এই বৈশিষ্ট্যসমূহের ধারক ও বাহক ছিলেন, যার নাম ছিল হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, যাকে মুসলেহ্ মওউদও বলা হয়। বড়রা তো এটি জানেনই, যে শিশুরা জামা'তের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত, তারাও এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। আতফাল থেকে নিয়ে খোদ্দাম পর্যন্ত সব সংগঠনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছিল যে,সেই পুত্রকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে প্রখর মেধা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন জ্ঞানে পরিপূর্ণ করেছেন। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে তার শিক্ষা হয়ত প্রাথমিক পর্যন্ত ছিল, বরং তা-ও ছিল না। হ্যাঁ, তিনি স্কুলে যেতেন, কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজেই লিখেছেন বা জানিয়েছেন যে,তিনি কখনো পরীক্ষায় পাস করতেন না। পার্থিব পাঠ্য-বিষয়গুলোতে তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তার দ্বারা এমন সব জ্ঞানগত, ধর্মীয় ও প্রশাসনিক কাজ করিয়েছেন যে, বড় বড় শিক্ষিতদেরও তার সামনে স্কুলের বালকের মতো মনে হয়, একেবারে শিশুর মতো মনে হয় এবং তার ৫২ বছরের খিলাফতকাল এর সরব সাক্ষী।

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন, প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ধর্মীয় ও কুরআনিক জ্ঞানের তো কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। তিনি পার্থিব বিষয়াদিতেও যেমন- দেশীয় রাজনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন এবং বহুপ্রবন্ধ রচনা করেছেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে অসাধারণ মানের প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন। অর্থনৈতিক বিষয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন ব্যবস্থা যেমন- সমাজতন্ত্রবাদ, কমিউনিজম ও পুঁজিবাদ সম্পর্কেও তিনি বিশ্লেষণাত্মক বক্তৃতা করেছেন যা পরবর্তীতে বই-আকারেও ছাপা হয়েছে। এটি জামাতের সাহিত্যভুক্তরয়েছে।এমনকি সামরিক বিষয়াদি ও সেনা সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানেরএমনসবকথা তিনি বর্ণনা করেছেন, যা শুনলে মানুষ অবাক হয়ে যায়। অনেক বক্তৃতা তিনি বাইরের লোকদের সামনে দিয়েছেন আরতারা সেগুলোর গভীরতাও প্রজ্ঞার প্রশংসা না করে পারেনি। হাজার হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে এসব রচনা ও বক্তৃতা বিদ্যমান। সংক্ষিপ্ত সময়ে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা সম্ভব নয়, বরং শুধু পরিচিতিও তুলে ধরা সম্ভব নয়। নমুনাস্বরূপ আমি এখানে কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করব যেগুলো শুধু পরিচিতিমূলক।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: "সর্বদা সত্য কথা বল, যখন তোমাদের কাছে আমানত রক্ষিত হয়, তখন তা আত্মসাৎ করিও না এবং প্রতিবেশীর সহিত সর্বদা সদয় আচরণ কর।" (বাইহাকি ফি শোবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

'ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা', 'নুতন বিশ্বব্যবস্থা', 'ইসলামে মতভেদের সূচনা'– এই বিষয়গুলি এমন, যেগুলো প্রায়ই জামা'তে আলোচিত হয়। এগুলি ছাড়াও বহু রচনা যা সচরাচর মানুষের সামনে আসে না, সেগুলোর পরিচয় আমি উপস্থাপন করব।

তিনি 'তুরস্কের ভবিষ্যৎ এবং মুসলমানদের কর্তব্য'শিরোনামে একটি পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এর বিশ্লেষণ করেছিলেন। এটি ১৯১৯ সালের ঘটনা। অর্থাৎ তাঁর খিলাফতের প্রারম্ভিক যুগের কথা। এর সার সংক্ষেপ বা পরিচিতি হলো, মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের প্রতিটি সুযোগ পূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য হুযূর এমন একটি সময়ে, যখন তুরস্কের সরকার হুমকির সম্মুখীন ছিল, অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত পথনির্দেশনা দিয়ে ১৯১৯ সালের১৮ সেপ্টেম্বর এই পুস্তকটি লিখেছিলেন। ভিন্নমতাবলম্বী মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির জন্য তিনি এইদিকনির্দেশক নীতি বর্ণনা করেছিলেন [সেখানে তুরস্ক সরকারের পক্ষে একটি জলসা হওয়ার কথা ছিল] তিনি (রা.) বলেন: আমার মতে এই জলসার ভিত্তি শুধু এটি হওয়া উচিত যে, একটি মুসলিম সাম্রাজ্যকে সরিয়ে দেওয়া বা অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দেওয়া এমন একটি কাজ যা মুসলমান হিসেবে অভিহিত প্রতিটি ফির্কা অপছন্দ করে এবং এর কল্পনাও তাদেরকে কষ্ট দেয়।

তারপর তিনি এ-ও বলেন:তুর্কি সাম্রাজ্য এবং ইসলামের কেন্দ্র হেজাজ সম্পর্কে আমার দিকনির্দেশনা এরূপ– আরবদের জাতিগত আত্মাভিমান ফুঁসে ওঠছে এবং তারা স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর। তেরোশত বছর পর এখন তারা পুনরায় নিজেদের চার দেয়ালের শাসক নিজেরা হয়েছে এবং নিজেদের সুশাসন ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে তারা যে স্বাধীনতার যোগ্য– তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এ সম্পর্কে কোনো নতুন প্রস্তাব সফল হতে পারে না, আর কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি তা গ্রহণও করতে পারে না।

তুরস্কের উন্নতির জন্য তিনি এই পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, শুধু জলসা-সমাবেশ এবং বক্তৃতায় কাজ চলবে না, আর টাকা জমা করে বিজ্ঞাপন ও নিবন্ধ প্রকাশ করার মাধ্যমেও (তা হবে) না, বরং একটি নিয়মিত সংগ্রাম দ্বারা (তা হতে পারে) যা বিশ্বের সমস্ত দেশে এই কাজ সম্পাদনের জন্য করা উচিত। তিনি (রা.) বলেন:এই যুগ হলো জ্ঞানের যুগ এবং মানুষ প্রতিটি বিষয়ের জন্য যুক্তি চায়। তাই এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিত-সুসংগঠিত ব্যবস্থা থাকা উচিত। অর্থহীন কাজ জ্ঞানীর কাজ নয়।"

একই কথা আজও মুসলমানদের ভাবা উচিত। এটা তো শুধু তুর্কি সরকারের সাথে সম্পর্কিত ছিল সেই সময়ে। আজ পূর্বের চেয়ে অধিক মুসলিম বিশ্ব এবং আরব বিশ্বের এদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন যে, শুধু স্লোগান দেওয়া এবং মিটিং করার মাধ্যমে কাজ হবে না, বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

তুর্কি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও পক্ষপাতিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন:পূর্বপুরুষদের যুগ থেকে তাদের অন্তরে, অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী লোকদের অন্তরে, ইসলাম সম্পর্কে এতটা কুধারণা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে তারা ইসলামকে একটি সাধারণ ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করে না, বরং মানুষকে মানবতা থেকে বের করে পশুতে, বরং হিংস্র পশুতে পরিণতকারী এক শিক্ষা মনে করে। ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মগুলোকে যদিও তারা ঘৃণাযোগ্য মনে করে কিন্তু সেগুলো থেকে তারা পালায় না, কিন্তু ইসলামকে তারা ভয় পায়। অর্থাৎ যারা ইসলাম বিরোধী, তারা এর অগ্রগতিকে সভ্যতা-ভব্যতার পথে শুধু বাধা হিসেবেই মনে করে না, বরং স্বয়ং মানবতার জন্যই এটিকে ধ্বংসাত্মক বলে বিশ্বাস করে।

আর আজকাল তো এর ওপর পূর্বের চেয়েও অধিক জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জায়গায়, প্রতিটি দেশে যারা ডানপন্থী বা তাদের সমমনারা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে বড় বড় অভিযান চালাচ্ছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করছে।এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য তিনি (রা.) এই পথনির্দেশনা দিয়েছিলেন যে,

"মুসলমানদের উচিত নিজেদের ভুল থেকে তওবা করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে মনোযোগী হওয়া এবং ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করা এর বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং অন্যদের সচেতন করা, যাতে সেই কষ্ট ও পশ্চাৎপদতার মুসলমানরা সম্মুখীন তা দূর হয়। যদি ধর্মের জন্য তারা তবলীগ না করে, যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশের অধীনে তারা এই অতুলনীয় শিক্ষাকে জগদ্বাসীর সামনে উপস্থাপন না করে, বাস্তবে তো এটিই হয়েছে যে, প্রকৃত ইসলামকে তারা কখনো উপস্থাপন করে নি, তাহলে এখন অন্ততপক্ষে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হলেও কিছুটাচেষ্টা উচিত। জীবিত থাকতে হলে তার জন্যই কিছু চেষ্টা করা উচিত। কারণ তাদের জীবন এবং ইসলামের তবলীগ দুটো অঙ্গাঅঙ্গী জড়িত হয়ে । "

(তুর্কী কা মুস্তাকবিল, আনেয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬-১৮)

অতএব, আজও মুসলমানদের এই নীতি-ই অবলম্বন করা প্রয়োজন, নতুবা ইসলামবিরোধী বিশ্ব মুসলমান দেশগুলোর জন্য জীবন ক্রমশ দুর্বিসহ করতে থাকবে এবং করছেও বটে।

এরপর অল পার্টিজ কসফারেন্স (তথা 'সর্বদলীয় সম্মেলন') এর একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। তখন তিনি 'এক নযরে সর্বদলীয় সম্মেলন' নামে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এই প্যাম্ফলেটটি হুযূর (রা.) অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্টিস কনফারেন্সের বৈঠকে উপস্থাপন করার জন্য ১৩ই জুলাই, ১৯২৫ সালে লিখেছেন। সম্মেলনের আয়োজকদের আকাঙ্ক্ষা ছিল, আহমদীয়া জামা'তের ইমাম যেন স্বশরীরে এতেযোগদান করে নিজের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, আমি স্বয়ং এতে যোগদান করতে অপারগ কিন্তু আমার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমার মতামত বা পরামর্শ উপস্থাপন করছি। এই প্যাম্ফলেটে হুযূর (রা.) সর্বপ্রথম ইসলামের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংজ্ঞা বর্ণনা করেন আর বলেন, ইসলামের একটি ধর্মীয় সংজ্ঞা আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি সে যেভাবে চায় এটিকে সংজ্ঞায়িত করার অধিকার রাখে। দ্বিতীয়ত হলো, ইসলামের রাজনৈতিক সংজ্ঞা। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কারা মুসলমান– এর উত্তর কেবল সেসব হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং শিখরা-ই দিতে পারবে, যাদের সাথে মুসলমানদের রাজনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। কেননা এক দলের অনুসারী, যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে এবং মনে করে, তাদেরকে অন্য ফিরকার লোকেরা অমুসলমান মনে করলেও রাজনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে হিন্দু ও শিখরা যখন তাদের সাথে লেনদেন করবে তখন তাদের সাথে একই ব্যবহার করবে। আর তারা একদলের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, অন্য দলের বিরুদ্ধেও তা-ই করবে। প্রত্যেক ফিরকাকে তারা মুসলমান জ্ঞান করেই ব্যবহার করবে। অতএব, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের স্বার্থ এক, কিন্তু মুসলমানরা এই সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবন না করলে অন্যরা এক এক করে তাদেরকে গ্রাস করবে আর তখন তাদের বোধোদয় হবে যখন বোধোদয়ে কোনো লাভ হবে না। তাই হুযূর (রা.) সকল মুসলমান ফিরকার সামনে এই অমূল্য নীতি উপস্থাপন করেন যে রাজনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে মুসলমানদের মাঝে পূর্ণ ঐক্য এবং সংহতি থাকা উচিত। কেননা, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি যদি কোনো জাতি বা দলকে পৃথক করে দেন তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব যে, তারা অন্য জাতির প্রতি ঝুঁকে পড়বে না।

এরপর তিনি (রা.) ইসলামের উন্নতি ও প্রসার এবং এর রাজনৈতিক দৃঢ়তার জন্য তিনি বিভিন্ন প্রস্তাব দেন এবং বলেন, ইসলামের দৃঢ়তার জন্য আবশ্যক হলো, গোটা ভারতে ইসলামের প্র চার-প্রসারের জন্য তবলিগী ব্যবস্থপনা প্রতিষ্ঠা করা এবং তবলিগী সংগঠনগুলোর (মাঝে) পারস্পরিক ঐক্য গড়ার কোনো উপায় বের করা। কেননা, ইসলামের জীবন তবলীগের ওপরই নির্ভরশীল আর এজন্য একটি পূর্ণাঙ্গীণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা আবশ্যক। (আর এখন তো একাজের ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বজুড়ে।) অধিকন্তু মুসলমানদের শিল্প এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির জন্য রীতিমতো (একটি করে) বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা উচিত। প্রত্যেক বিভাগের একটি লক্ষ্য থাকবে আর বছর শেষে অবহিত করা হবে যে, (সেই) লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে। (এখন এটি তো বড়ো বড়ো ইসলামী রাষ্ট্রের কাজ।) এছাড়া অনতিবিলম্বে এমন একটি কমিটি গঠন করাও আবশ্যক, যারা এ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে যে, মুসলমানদেরকে অন্যান্য জাতির প্রভাব থেকে কীভাবে মুক্ত করা যায় আর জীবনের এমন কোন্ কোন্ ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে দক্ষ মুসলমানদের সংখ্যা অনেক কম। অতঃপর সেই কমিটি এই ঘাটতি পূরণের জন্য চেষ্টা করা উচিত। একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন এবং বলেন, সুদ বিহীন কোনো উপায় বের করা সম্ভব হলে, যা বের করা সম্ভব; তাহলে আমাদের জামা'তও এতে যুক্ত হতে প্রস্তুত আছে। আর তিনি (রা.) বায়তুল মাল এবং মুসলিম চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠার বিষয়েও প্রস্তাব দেন, অধিকন্তু যেখানে অমুসলিম সরকার শাসন করছে, ফৌজদারী মামলা ছাড়া মুসলমানদের অন্যান্য ঝগড়া-বিবাদ আদালত পর্যন্ত টেনে নেওয়ার পরিবর্তে পরস্পর মিলেমিশে মীমাংসার জন্য পঞ্চায়েত প্রথা চালু করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি (রা.) বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হলো, পরস্পরের ধর্মীয় বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ না করা। উদার মনোভাব নিয়ে অন্যদেরকে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে দিন এবং স্বয়ং নিজের

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal, From Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করুন। হুযূর (রা.) ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প ও কারিগরি (পেশা) সম্পর্কে বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য এমন একটি ক্ষেত্র যেবিষয়ে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি অবহেলা করেছে। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের গোলাম বা দাসে পরিণত হয়েছে। (এটি সে যুগেছিল এবং এখন স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে, পৃথিবীর বড়ো বড়ো ধনাঢ্যরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী,ইহুদী হোক বাখ্রিষ্টান অথবা অন্য যে কোনো ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন আমরা তাদের দাসত্ব করছি। তখনো একই অবস্থা বিরাজ করছিল। বর্তমানে এক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের এবং ব্যবসায়ীদের দাসে পরিণত হচ্ছি।) যেমনটি আমি বলেছি,তাই মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং কারিগরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের উন্নতিরজন্যও বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। পরিশেষে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুসলমানদের পারস্পরিক বিরোধ নিরসন করে পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আমিআবারওএ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য বা প্রবন্ধ শেষ করছি যে, আমাদের সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হবে এবং সকল পরিকল্পনা নিষ্ফল হবে, যদি এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে অনুধাবন না করি যে,আমরা একে অপরকে কাফির বললেও অন্যদের দৃষ্টিতে আমরা (সবাই) মুসলমান। আর একের ক্ষতি মানেই অন্যের ক্ষতি। তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের ধর্মীয় ফতওয়াগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত। কেননা, এগুলো তাদের কর্মকাণ্ডেরউর্ধ্বে। ইসলাম কখনো বলে না যে, তোমাদের রাজনৈতিক স্ব ার্থরক্ষার খাতিরে তোমরা তাদের সাথে মিলে কাজ করতে পারবে না, যাদেরকে তোমরা মুসলমান বলে মনে করো না। মহানবী (সা.) যদি পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সাথে সমঝোতা করতে পারেন, তাহলে মুসলমান বলে দাবিদার ফিরকাগুলো ইসলামের রাজনৈতিক অগ্রগতি বরং বলা যায় যে,রাজনৈতিক নিরাপত্তার স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করতে পারবে না কেন? আমরা যদি এই সময়ে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি, তাহলে নিশ্চিতরূপে এটিই প্রমাণিত হবে যে, আমাদের বিরোধ ইসলামের জন্য নয় বরং ব্যক্তিস্বার্থেএবং নিজের কামনা-বাসনার জন্য। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই দুর্ভাগ্য হতে নিরাপদ রাখুন।

(অল মুসলিম পার্টিস কনফারেন্স কে প্রেগ্রাম পর এক নজর, আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৮-১০)

পাকিস্তান ও কতিপয় মুসলমান রাষ্ট্রের সার্বিক চিত্র এটিই। বিশেষ করে আহমদীদের বেলায় তাদের মনোভাব হলো, এরা কাফির। এমনিতে তো প্রত্যেক ফিরকাই একে অপরকে কাফির বলে থাকে। আর এ কারণেই অমুসলিম বিশ্বে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে আর তারা মুসলমানদের ক্ষতি করছে। কাজেই, আজও অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ও মুসলমানদের এ বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

(পাক-ভারত বিভাজনের সময়ে,) ভারতের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি উত্থাপিত হয়। বৃটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতার বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিল। যাদের কাজ ছিল, প্রতি দশ বছর পর পর পর্যালোচনা করে দেখা যে, এখানকার জনগণকে পৃথক সরকার গঠনের বা স্বায়ত্তশাসনের জন্য কতটুকু অধিকার দেওয়া যেতে পারে। এ কমিশনের প্রথম সভাপতি ছিলেন একজন ইংরেজ ব্যারিস্টার, যার নাম ছিল স্যার জন সাইমন।

যাহোক, এই কমিশন এবং এর সিদ্ধান্তগুলির বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন সময়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে নিজের বিস্তারিতমতামত দিয়েছেন এবং মুসলমানদের পথনির্দেশনাও দিয়েছেন। এ প্রেক্ষাপটে একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের ইতিহাসে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বরাতে যার বিশদ বিবরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃটিশ সরকারের গঠিত কমিশনের প্রতিবেদন ভারতীয় জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়, তাই তারা সেটি গ্রহণ করেনি। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ হতে গোল টেবিল সম্মেলনের আয়োজনের ঘোষণা দেওয়া হয় যেন, বৃটিশ ও ভারতের প্রতিনিধিরা একস্থানে একত্রিত হয়ে ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে। এহেন পরিস্থিতিতে হুযূর (রা.) মুসলমানদের দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য দ্রুত এই প্রবন্ধটি লেখেন আর তাদেরকে এ মর্মে নসীহত করেন- তারা যেন পারস্পরিক বিভেদ ও মতবিরোধ পরিত্যাগ করে জাতির কল্যাণার্থে একতা ও সংহতি বজায় রেখে কাজ করে। একমাত্র এ পদ্ধতি অবলম্বনের করলেই তারা বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করে নিজেদের অধিকার আদায়ে সফল হতে পারবে।

কনফারেন্সে তাদের এমন প্রতিনিধি যাওয়া উচিত যারা জাতির প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব পালনে সক্ষমহবে। হুযূর (রা.) এ পর্যায়ে সরকার পক্ষকেও পরামর্শ প্রদান করেন, যেন তারা রাজনৈতিক দলগুলোর পরামর্শ নিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে, তাহলে কনফারেন্সের সিদ্ধান্ত মানুষ খুশিমনে মেনে নেবে।

মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে হুযূর (রা.) বলেন, আমার দৃষ্টিতে 'অল মুসলিম পার্টিজ'-এর কনফারেন্সের জন্য কাজ করার সময় এসে গেছে। কেবল এটি ছেপে দেওয়াই যথেষ্ট নয় যে, এগুলো হলো মুসলমানদের দাবি। এমন লোক যদি গোলটেবিল বৈঠকে বসে যারা এসব দাবিকেউপেক্ষা করবে, সেক্ষেত্রে কনফারেন্সের সিদ্ধান্তের কোনো মূল্যই আর থাকে না। অতএব এখনই সময়- প্রথমত, তারা সরকারকে ভুল নির্বাচনের ক্ষতিকর ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করবে এবং দ্বিতীয়ত, জনগণকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত করবে; আর তাদের ততক্ষণ স্বস্তির নিশ্বাস নেয়া উচিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের সিদ্ধান্ত মুসলমানদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের মাধ্যমে না হবে।

(গোল টেবিল কনফারেন্স এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১১, পৃ: ১৩-১৪)

আর সে সময়ের পরিস্থিতি অনুযায়ী এই পরামর্শ অনেক স্থানে গুরুত্বের সাথে গৃহীত হয়েছিল।

অতঃপর ভারতবর্ষের তৎকালীন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তার সমাধানের বিষয়ে তিনি (রা.) প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রবন্ধে সে সময় বিরাজমান পরিস্থিতির সমাধান উল্লেখ করেন। সায়মন কমিশনের রিপোর্ট ছাপার কিছুকাল পর যুক্তরাজ্য সরকার লন্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে, যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করে ভবিষৎ কর্মপদ্ধতি প্রস্তাব করা যায়। সায়মন কমিশন যেহেতু মুসলমানদের অধিকারের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করে নি, তাই হুযূরের দুশ্চিন্তা ছিল এবং তিনি চাইতেন, যেন ভবিষ্যতে মুসলমানদের অধিকার উপেক্ষিত না করা হয়। এ কারণে হুযূর (রা.) এহেন পরিস্থিতিতে সমীচীন মনে করলেন, যেন সায়মন কমিশন রিপোর্টের ওপর পর্যালোচনা করে এর ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করা যায় এবং ভারতবর্ষের সমস্যাবলির এমন সমাধান উপস্থাপন করা যায়, যার ফলে ভবিষ্যতে সকল জাতি সন্ধি ও মৈত্রির সাথে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে।

যেমন তিনি (রা.) বলেন, আমি মনে করি, একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হবার কারণে দেশের রাজনীতির সাথে আমার ততটা সম্পৃক্ততা নেই যতটা সেসব লোকের রয়েছে যারা দিনরাত এ কাজেই নিবেদিত থাকে। কিন্তু সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের বিষয়ে আমার দায়িত্ব অন্যদের চেয়ে বেশি।এছাড়া এ জগতের হট্টগোল থেকে পৃথক হবার কারণে সম্ভবত কিছু বিষয়ের গভীরে সেসব মানুষের তুলনায় সহজে অবগাহন করতে পারি, যারা কোন না কোন দলের পক্ষ থেকে এ যুদ্ধে পরস্পরের বিরুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে। সুতরাং এখন যেহেতু গোলটেবিল বৈঠকের ঘোষণা দেবার কারণে মানুষের চিন্তাচেতনা ভারতবর্ষের সমস্যাবলির সমাধানের দিকেধাবিত হয়ে আছে, [এটি সে যুগে অনেক বড়ো একটি বিষয় ছিল] তাই আমি এটাই সমীচীন মনে করছি যে, আমার চিন্তাধারা আমি উভয় দেশের বিদ্বেষমুক্ত মানুষের সামনে উপস্থাপন করি। হুযূর (রা.) তাঁর পর্যালোচনার মাঝে মুসলমানদের অধিকারসমূহ এবং দাবিদাওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এর যৌক্তিকতা স্পষ্ট করেন। একইসাথে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাবলির বিষয়ে ক্ষুরধর যুক্তি ও হৃদয়গ্রাহী সমাধান উপস্থাপন করেন। এই সর্বাঙ্গীনসম্পূর্ণ রচনার ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশের জন্য তৎক্ষণাৎ পৌঁছানো হয় যেন গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা এটি পড়ে উপকৃত হতে পারে। মুসলমান প্রতিনিধিরা এদ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়। যেমন তারা প্রথমবারের ন্যায় সর্বসম্মতিক্রমে সফলতার সাথে তাদের দাবিসমূহ কনফারেন্সে উপস্থাপন করে। সেই যুগে অনেক উপকার হয়েছে। ইংল্যান্ডের নীতিনির্ধারক ব্যক্তিদের ওপর এর গভীর প্রভাব পড়ে এবং তারা ভারতে মুসলমানদের বিশেষ মর্যাদা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তাদের দাবিসমূহের যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

হুযূর (রা.)-এর এই পুস্তক ভারত ও ইংল্যান্ড উভয় স্থানেই সমাদৃত হয় এবং তা অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করা হয়। আর কতক চিন্তাশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাষায় হুযরতে সাধুবাদ জানান।"

(হিন্দুস্তান কে মজুদা সিয়াসি মাসলা কা হাল, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১১, পৃ: ১৮-১৯)

আহমদীয়াতে ইতিহাসে এরূপ বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। এই পর্যালোচনা যেভাবে আমি বলেছি, উভয় স্থানেই পরম গ্রহণীয়তা পায় এবং গুরুত্ব সহকারে পড়া হয়। এখন এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

উত্তর প্রদেশের সাবেক গভর্নর লর্ড মেস্টন বলেন, "আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আপনি আমাকে জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম সাহেবের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পুস্তক আমার নিকট প্রেরণ করেছেন। এটি প্রেরণকারীকে উদ্দেশ্য করে লিখছেন। এর পূর্বেও আমি তাঁর কয়েকটি রচনা আগ্রহভরে পাঠ করেছি। আমি আশা করি, এই পুস্তকটি পড়েও আমি আনন্দিত ও উপকৃত হবো।" (তারিখে আহমদীয়াত,৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৪)

সংসদ সদস্য লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার কেনওয়ার্দি বলেন, 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান' শীর্ষক পুস্তক প্রেরণের জন্য আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। আমি এটি গভীর আগ্রসের সাথে পড়েছি।"

(তারিখে আহমদীয়াত,৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৪)

উত্তর প্রদেশের গভর্নর এবং পাঞ্জাবের সাবেক গভর্নর স্যার ম্যালকম হেলে লন্ডন মসজিদের ইমাম সাহেবকে লেখেন, এই পুস্তকের জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্র কাশ করছি, যা আপনি জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম সাহেবের পক্ষ থেকে আমার নামে প্রেরণ করেছেন। আমি জামা'তে আহমদীয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং এই স্পৃহাকে খুব ভালোভাবে বুঝি আর সম্মানেরদৃষ্টিতে দেখি– যাতে সমৃদ্ধ হয়ে তিনি ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলির সমাধান নিয়ে কাজ করছেন। আমি বিশ্বাস করি, এই পুস্তক আমার উপকারে আসবে এবং আমি এটি অত্যন্ত আগ্রহভরে পাঠ করব।

(তারিখে আহমদীয়াত,৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৫)

এরপর স্যার হোন অও-মিলার বলেন, এই চটি পুস্তিকা প্রেরণেরজন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি– যেখানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আহমদীয়া জামা'তের ইমামের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সায়মন কমিশনের প্রস্তাবনার ওপর এটিই একমাত্র বিশদ সমালোচনা, যা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আমি এই ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ সম্পর্কে এমন কিছুই বলব না, যে বিষয়ে ভিন্নমত থাকাএকটি স্বাভাবিক বিষয় কিন্তু আমি আহমদীয়া জামা'তের মহামান্য ইমাম যে আন্তরিকতা, যুক্তিযুক্ততা ও স্পষ্টতার সাথে তাঁর জামা'তের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন, আমি তার প্রশংসা করি এবং আমি মহামান্য হযরত মির্যা বশিরউদ্দীন সাহেবের উন্নত চিন্তাধারার গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি।"(তারিখে আহমদীয়াত,৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৫)

এরপর শ্রদ্ধেয় পিটারসন সি.এস.আই.সি.আই.আই.ই বলেন, 'ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান' শীর্ষক পুস্ত ক প্রেরণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি এখন পর্যন্ত পুস্তকটি পাঠ করে শেষ করতে পারি নি। আশা করছি, কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ করে ফেলব, কিন্তু যতটকুই আমি পড়েছি তা দ্বারা নিঃসন্দেহে এটিই প্রকাশিত হয়, এই পুস্তকটি বর্তমান সমস্যাবলিবুঝানোর জন্য একটি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি এতে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর প্রেরণকারীকে লিখছেন, আশা করি, আমি সাক্ষাৎ করব। " (তারিখে আহমদীয়াত,৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৭)

আলীগড়ের ডাক্তার জিয়া উদ্দিন সাহেব বলেন, "আমি তার পুস্তক অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, ইউরোপে এটি ব্যাপকহারে প্রচার করুন। প্রত্যেক সাংসদকে অবশ্যই এর একটি করে কপি প্রেরণ করা হোক এবং ইংল্যান্ডের সকল সংবাদপত্রের সম্পাদককে এক কপি করে যেন প্রেরণ করা হয়। ভারতবর্ষের তুলনায় এ পুস্তকটি ইংল্যান্ডে অধিক পরিমাণে প্রচার করা দরকার। তিনি ইসলামের এক বিশেষ সেবা করেছেন।" (তারিখে আহমদীয়াত,৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৮)

এখানে এই অ-আহমদী লিখছেন যে, তিনি ইসলামের সেবা করেছেন আর এখন অআহমদীরা বলে যে, আহমদীরা অমুসলিম।

করাচির এমএলএশেঠ হাজী আব্দুল্লাহ্ হারুন সাহেব বলেন, "আমার মতে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বিষয়াবলি সম্পর্কিত যে পরিমাণ পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে সে-সবের মাঝে "ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান" পুস্তকটি শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলোর একটি।"

(তারিখে আহমদীয়াত,৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৮)

আল্লামা ডাক্তার স্যার মুহাম্মদ ইকবাল লিখেছেন, "আমি এই পুস্তিকার কয়েকটি জায়গা পড়েছি, এটি চমৎকার এবং সর্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ পর্যালোচনা।"

(তারিখে আহমদীয়াত,৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৮)

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

লাহোরের ইনকিলাব পত্রিকা লিখেছে, "মির্যা সাহেব এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলমানদের অনেক বড় সেবা করেছেন। মির্যা সাহেব সেই কাজ সম্পাদন করেছেন যা বড় বড় ইসলামি ফিরকাগুলোর করা উচিত ছিল।"

(তারিখে আহমদীয়াত,৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৮)

লাহোরের 'সিয়াসাত' পত্রিকা লিখেছে, ধর্মীয় মতানৈক্যের বিষয়টিকে এক পাশে রেখে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখা যায়, মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেব সাহিত্যের জগতে যে কাজ করেছেন তা ব্যাপকতা ও কল্যাণ প্রসারের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বপ্রকার প্রশংসার যোগ্য এবং রাজনীতিতে তার জামাতকে সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি চালানের ক্ষেত্রে তিনি যেই কর্মপন্থার সূচনা করে নিজ নেতৃত্বে সেটিকে নিজ সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়েছেন তা প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ মুসলিম এবং সত্যসচেতন ব্যক্তির প্রশংসা আদায় করে। এক প্রজন্ম তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাক্ষী। [বলছে, এক প্রজন্ম তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাক্ষী]। আর নেহেরুর রিপোর্টে র বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা, সাইমনকমিশনের সামনেইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করা সমসাময়িক বিষয়গুলোর ওপর ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যবহুল বক্তৃতা প্রদান এবং মুসলমানদের অধিকারের স্বপক্ষে দলিল-প্রমাণে পরিপূর্ণ পুস্তকাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি অনেক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। আলোচিত পুস্তক সাইমন রিপোর্ট সম্পর্কে ইংরেজিতে প্রকাশিত তাঁরযে বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা রয়েছে তা অধ্যয়নে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা অনুধাবন করা যায়। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি পরিশীলিত ও মানুষকে মুগ্ধ করার মত আর তারা কথাভাষা সহজবোধ্য।

(তারিখে আহমদীয়াত,৫ম খণ্ড, পৃ: ২১৮)

এই ছিল কিছু পর্যালোচনা।

অতঃপর বিশ্বের বর্তমান অস্থিরতার বিষয়ে ইসলাম কি সমাধান প্রদান করে– এ সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন। বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে যে সমস্ত বক্তৃতা করেছেন, সেগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিশ্ব শান্তির বিষয়কে দৃষ্টিপটে রেখে ০৯ অক্টোবর ১৯৪৬ সালে বিকাল ০৫:৩০ মিনিটে দিল্লির আর্ট পার্ক রোডে এক বিশাল প্রাঙ্গণেএই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা প্রদানকরেন। এ বক্তব্য শোনার জন্য কয়েক শত অ-আহমদী এবং অ-মুসলিম সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা খুব মনোযোগ সহকারে এবং শান্তভাবে হুযূরের বক্তৃতা শুনেছেন। প্রথমবার এটি ১৫ এপ্রিল ১৯৬১ সালে আল-ফযলে ছাপা হয়েছিল। যাইহোক এ বক্তৃতা সম্পর্কে দিল্লির তেজ পত্রিকা ১৪ অক্টোবর ১৯৪৬ সালের প্রকাশনায় নিম্নলিখিত নোট ছাপিয়েছে যে, "আহমদীদের ইমাম হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) এক বক্তৃতায় বলেন, শান্তি ও নিরাপত্তার বিষয়টি মানব সভ্যতার ন্যায় প্রাচীন বিষয়। কেননা মানবপ্রকৃতির সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় তবে এলক্ষ্যে প্রতিহিংসা ও ঘৃণা দূর করতে হবে। বিষয়টি রাজনৈতিক নয় বরং বিষয়টি নৈতিক আর আমরা যদি আল্লাহর প্রভুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকি আর (জাগতিক) রুটির মোহ এবং লোভ ইত্যাদি পরিত্যাগ করি তবেএরপরে আমাদের মাঝে ঘৃণা ও লোভলালসার পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব আর প্রেমময় আবেগ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। ধর্মজগতের মতবিরোধের পরিসমাপ্তি সম্ভব, শর্ত হলো, আমরা যেন পরস্পরের আবেগকে সম্মান করা শিখি। [ধর্ম জগতের মতানৈক্য পরিসমাপ্তি সম্ভব, তবে শর্ত হলো,আমরা যেন একে অপরের আবেগকে সম্মান করতে শিখি আর নিজেদের মাঝে সহনশীলতা সৃষ্টি করি। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন সহিষ্ণুতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অনুরূপভাবে জাগতিক ক্ষেত্রেও তা আবশ্যক। মুসলিম, হিন্দু ও খ্রিষ্টিয় যুগেও এটি ব্যাপক ছিল। তিনি (রা.) বলেন, জাতপাত, ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি মতবিরোধ ঘুচিয়ে বিশ্ব সম্প্রীতির চেতনা সৃষ্টি করা উচিত।"

(দুনিয়া কি মওজুদা বেচৈনী কা ইসলাম ক্যা ইলাজ পেশ করতা হ্যা?, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ১১-১২)

আমাদের দায়িত্ব হলো, নির্যাতিত নিপীড়িত জাতিসমূহকে সাহায্য করা, তারা আমাদেরকে মারুক কাটুক যাই করুক না কেন –এ আপত্তির বিষয়ে তিনি (রা.) একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

দিল্লির পত্র-পত্রিকার মন্তব্য ছিল, ইংরেজি ভাষায় পত্রিকায় লিখেছিল যে, আহমদীরা পাকিস্তানের সমর্থন করছে অথচ তাদের সাথে অন্যান্য মুসলমানরা ভাল ব্যবহার করে নি। [(হুযূর বলেন) আহমদীদের উসকে দিচ্ছে কেননা আহমদীরা পাকিস্তানের সমর্থন করে অথচ (খোদ)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

"আল্লাহ্ সকল বিষয়ে হিসাবগ্রহণকারী।"

(সূরা নিসা: ৮৭)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Imam Hossain sb, Khundanga, Bankura

মুসলমানরাই তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে না!] অতঃপর লিখে যে, যখন পাকিস্তান গঠিত হবে তখন মুসলমানরা তাদের সাথে একই ব্যবহারকরবে যা ইতঃপূর্বে কাবুলে তাদের সাথে হয়েছিল আর তখন আহমদীরা বলবে, আমাদেরকে ভারতবর্ষে অন্তর্ভুক্ত করে নাও। পত্রিকা এভাবে মন্তব্য করেছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৬ মে ১৯৪৭ সালে মাগরিবের নামাযের পর এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আমাদের দায়িত্ব হলো, আমরা যেন অত্যাচারিত জাতিসমূহের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াই, প্রতিদানে তারা আমাদেরকে মারুক কাটুক (যাই করুক না কেন)। তিনি (রা.) আরো বলেন, আমাদের শত্রুপক্ষ যদি আমাদের প্রতি অন্যায়, অবিচারও করে তবুও আমরা ন্যায়পরায়ণ থাকব। হুযূরের (রা.) এই ভাষণটি কাদিয়ানেও পুস্তকাকারে ছাপা হয়েছে। (আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ১৯)

আজও কতক ব্যক্তি এ আপত্তি উত্থাপন করে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কেন পাকিস্তানে যোগ দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন? কাজেই এ ভাষণটিই এর জবাব। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল আর জামাত সর্বদা মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান থাকে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ একথা অস্বীকার করেন নি যে, জামাতের সাথে এ অন্যায় করা হবে না। তিনি (রা.) বলেন, যা কিছুই হোক না কেন, এখন মুসলমানদের সাহায্য করা আবশ্যক আর আহমদীদের তাদের পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য কেননা মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের একান্ত দায়িত্ব। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি (রা.) একটি বক্তৃতা করেন। যার সারসংক্ষেপ হলো, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরেপাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন যেখানে লাহোরের বড় বড়বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞজন ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন আর তারা তাদের বক্তৃতায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। প্রথম পাঁচটি বক্তৃতা লাহোরের মিনার্ড হলে ও ষষ্ঠ বক্তৃতাটি লাহোরের ইউনির্ভাসিটি হলে প্রদান করেন। তারা বলেন, লাহোরের মিনার্ড হলে ১৯৪৭ সালে ০৭ ডিসেম্বর তারিখে যে বক্তৃতা করেন আর সময় স্বল্পতার কারণে বিষয়বস্তুর কয়েকটি অংশ বর্ণনার বাকি ছিল। তাই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সর্বস্বাধারণের কল্যাণার্থেতার স্মৃতি থেকে আল-ফযল পত্রিকায় নিজ স্মৃতি প্রকাশ করিয়েছেন। পরবর্তীতে যা ০৯ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালের লাহোরে প্রকাশিত দৈনিক আল-ফযল পত্রিকায় প্রকাশ পায়। হুযূর নিজের এই বক্তৃতায় বনসম্পদ, কৃষি, পশু এবং সম্পদের দিক থেকে পাকিস্তানকে কিভাবে উন্নত করা যেতে পারে এর স্বর্ণালী নীতিসমূহ বর্ণনা করেন। বিভিন্ন প্রস্তাবনা দেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন।

(পাকিস্তান কা মুস্তাকবিল, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ৮)

এই বক্তৃতাটি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দস্তুরে ইসলামী বা ইসলামী আইন আসাসী অর্থাৎ- ইসলামী ইসলামী মৌলিক আইন বিষয়ে তিনি নিজের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ করেন।

কাদিয়ান থেকে লাহোর হিজরতের পর 'পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ'বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন এই বক্তৃতাটি সেসব বক্তৃতা মালার শেষ বক্তৃতা, যা হুযুর (রা.) লাহোরের ইউনিভার্সিটি হলে প্রদান করেছিলেন। যেভাবে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে বিষয়বস্তু ছিল 'ইসলামী সংবিধান' অথবা 'ইসলামী মৌলিক আইন' । এই বক্তৃতাটি সে সময় জনসাধারণের উপকারার্থে ১৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮সালে একটি প্রচারপত্র আকারে প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে আওয়ারুল উলুমের উনিশতম খন্ডে সংকলিত হয়েছে। এই বক্তৃতায় হুযুর (রা.) ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই বিষয়ে আলোকপাত করেন যে, পাকিস্তানে কোন্ ধরণের সংবিধান অথবা আইন কার্যকর হওয়া উচিত। তিনি (রা.) বলেন, সুতরাং যদি পাকিস্তানের সংবিধানেজনসংখ্যার দিক দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য এই আইন পাশ করা হয় যে, পাকিস্তানের সীমানায় মুসলমানদের জন্য কুরআন ও সুন্নত অনুযায়ী আইন বানানো হবে, এর বিরোধী কোন আইনবানানো বৈধ হবে না; তাহলে যদিও সরকারের ভিত্তি পুরোপুরি ইসলামী হবে না, কেননা সেটা হতে পারে না; কিন্তু সরকার পরিচালনার পদ্ধতি ইসলামী হয়ে যাবে। আর মুসলমানদের জন্য এর বিধানও ইসলামী হবে এবং এটিই ইসলামের দাবি। ইসলাম কখনোই বলে না যে হিন্দু, খ্রিস্টান এবং ইহুদীদের দ্বারাও ইসলামের বিধি-বিধান পালন করাতে হবে। বরং এটি (ইসলাম) এর সম্পূর্ণ বিপরীত। (আনোয়ারুর উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ১০-১১)

এটি তো সবাইকে স্বাধীনতা দেয়, প্রত্যেক ধর্মকে, প্রত্যেককে। আজকে তারা বলে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী আইন ও বিধান চলবে। কিন্তু বাস্তবে এরসূচনা ও পরামর্শ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) দিয়েছিলেন। এখন ইসলামের নামে আমাদের ওপর তারা অত্যাচার করছে। যেভাবে আমি বলেছি তিনি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী রাস্ট্রপরিচালনা এবং আইন বানানোর দিকে মনোযোগ আকর্ষন করেছিলেন। যদি আহমদীরা এতটাই ইসলামের বিরোধী হয়ে থাকে যেভাবে বর্তমান যুগের মোল্লারা বলে, তাহলে এই পরামর্শ ও মনোযোগে আকর্ষণের তাঁর কী প্রয়োজন ছিলো! যাহোক বর্তমানে দেশকে নাম সর্বস্ব মোল্লারা জিম্মি করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তা'লা কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি সৃষ্টি কুন যিনি তাদের ষড়যন্ত্র থেকে দেশকে মুক্তি দিবেন এবং দেশ উন্নতির পথে ধাবমান হবে।

এরপর একটি বিষয় হচ্ছে 'পাকিস্তান একটি ইট সেই ইসলামী ভবনের যাকে আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবো'। এই বক্তৃতাটি তিনি (রা.) কোয়েটার টাউন হলে প্রদান করেছিলেন। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) পাকিস্তান গঠনের অব্যবহিত পরেই 'পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে লাহোরে ছয়টি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এর কিছুকাল পরে হুযুর (রা.) পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরে যান এবং পাকিস্তানের হাজার হাজার বাসিন্দাদের 'পাকিস্তানের দৃঢ়তা' বিষয়ে নিজের দৃষ্টিউন্মোচনকারী ও গঠনমূলক চিন্তা-ভাবনা দ্বারা আলোকিত করেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে হুযুর কোয়েটাতে গমন করেন এবং কোয়েটায় অত্যন্ত তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা প্রদান করেন। যাতে তিনি পাকিস্তানের সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় সমস্যাবলীর দিকে পাকিস্তানের অধিবাসীদের দিকনির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে সবিস্তারে তাদেরকে তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় দায়িত্বাবলী সম্পাদন করার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। নিজের জোরালো ও ভালোবাসায় পূর্ণ বাক্যাবলীতে সীমাহীন ঈমানী শক্তি ও অদম্য উদ্দীপনা, দৃঢ়তা ও অবিচলতা দ্বারা লক্ষ লক্ষ মনোবলহীন ও দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে নবজীবন ও আশার এক প্রে রণা সঞ্চার করেন।হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ৪ জুলাই ১৯৪৮ সালে কোয়েটার টাউন হলে 'পাকিস্তান ও এর ভবিষ্যৎ' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। এটি আলফযলে ১৯৫২ সালের মার্চে প্রকাশিত হয় এবং জনসাধারণের ওপর এর অনেক প্রভাব পড়ে। (আনোয়ারুর উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৯)

১১ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে আহমদীয়া জামা'ত সারগোধা কোম্পানীবাগে 'পাকিস্তানের উন্নতি ও এ দেশের স্থিতিশীলতা' বিষয়ে মূল্যবান উপদেশসমূহ সম্বলিত একটি উন্মুক্ত জলসার আয়োজন করে। সে যুগে তো জলসা করা যেত। বর্তমানে তো আমরা তরবিয়তী জলসাও করতে পারি না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে জলসাটির একটি অনন্য বিশেষত্ব ছিল যে, এতে প্রথমবারের মত হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সারগোধা ও আশেপাশের অঞ্চলের সেসব হাজার হাজার আহমদী ও গয়ের আহমদী ব্যক্তিবর্গ যারা এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন; তাদেরকে নিজ মূল্যবান উপদেশ ও দিক-নির্দেশনাসমূহ দ্বারা লাভবান করেছেন। তাদের ইসলামী আদেশসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও পাকিস্তানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার প্রতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় মনোযোগ আকর্ষণ করেন। হুযুরের বক্তব্য শুরু থেকে শেষ অবধি গভীর আগ্রহ নিমগ্নতা ও মনোযোগের সাথে শোনা হয়। হুযুর (রা.) পাকিস্তানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, 'আমরা নিজেরা বলেছিলাম, হে খোদা! আমাদের এ দেশ দান কর। এখন এ দেশকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখা ও একে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব। যদি আমরা আমাদের দায়িত্বসমূহ অনুধাবন না করি তবে আমরা ইহকাল ও পরকালেও লজ্জিত হব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এটি বলবেন, আমি তোমাদের দাবি অনুযায়ী তোমাদেরকে এ দেশ প্রদান করেছি, কিন্তু তোমরা একে ধ্বংস করে ফেলেছ।

বর্তমানে মৌলভিরাই এ দেশকে ধ্বংস করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। পাকিস্তানের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি সকল শ্রেণীর লোকদের সততার সাথে নিজেদের কর প্রদান করতে এবং পাকিস্তানের সুরক্ষাকল্পে বেশিবেশি যুবকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য তাগাদা দিয়েছেন। সে দিনগুলোতে পত্রিকাসমূহে এ বিতর্ক চলছিল যে পাকিস্তান সরকার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছুই করছে না। আমরা তো পাকিস্তানকে ইসলামের স্বার্থে চেয়েছিলাম। (তিনি) এ বিষয়ে তিনি দৃষ্টি উন্মোচনকারী নির্দেশাবলী প্রদান করেছেন ও পরিশেষে উপদেশ প্রদানপূর্বক বলেন, শুধুমাত্র না'রাবাজিকরা কোন জাতির সফলতার চিহ্ন হতে পারে না। যদি এখন সবাই সমস্বরে নারায়ে তাকবির উচ্চকিত করতে ব্যস্ত হয়ে যায়, যদি এখনসকলে সমস্বরে এটি বলতে থাকে যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ, হিন্দুস্তান মুর্দাবাদ। তবে হিন্দুস্তানেরএকটি ইঁদুরও মরবে না। শুধুমাত্র না'রার মাধ্যমে তো কেউ মরবে না। কিন্তু আমি এতক্ষণ যা বললাম, বক্তব্যে যা উল্লেখ করলাম; যদি সবাই এর উপর আমল করতে আরম্ভ করে; ব্যবসায়ীরা যদি আয়কর পরিশোধ করে, জনগণ যদি বিনা টিকেটে রেল ভ্রমণ না করে, যুবকগণ যদি অহেতুক কাজে নিজেদের সময় অপচয় করার পরিবর্তে উচ্চশিক্ষিত হয় এবং শক্ত-সামর্থ্য যুবকগণ যদি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয় ,কর্মকর্তাগণ ঘুষ খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং সমস্ত কাজ সততা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 3-10 Apr 2025 Issue No.14-15

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ও পরিশ্রমের সাথে করে, তবে পাকিস্ত ান কার্যত শক্তিশালী হতে থাকবে। কিন্তু বর্তমানে পূর্বের থেকে অনেক বেশি এর বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে। এরপর তিনি বলেন, এরপর যদি আপনারা একবারও পাকিস্তান জিন্দাবাদ না বলেন তবুও ফলাফল এটিই দাঁড়াবে যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ। না'রা উচ্চকিত করা না না কর সর্বাবস্থায় পাকিস্তান জিন্দাবাদের বাস্তবিক প্রমাণ পাওয়া যাবে।"

(আনোয়ারুর উলুম, খণ্ড-২১, পৃ: ১৮-২০)

যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কিত অনেক বিষয়াদিও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'রাশিয়া ও সাম্প্রতিক যুদ্ধ' সম্পর্কিত বিষয়টি আমি বেছে নিয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার পোল্যান্ডে অনুপ্রবেশ করা সম্পর্কে ব্যাখ্যা মন্তব্য রয়েছে।

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন রাশিয়া পোল্যান্ডে অনুপ্রবেশ করে তখন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ প্রবন্ধটি লিখেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর দৈনিক আল-ফযলে এটি প্রকাশিত হয়। হুযুর এ প্রবন্ধে রাশিয়ার পোল্যান্ডে অনুপ্রবেশের কারণ ও উদ্দেশ্যসমূহের কথা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেন যে, রাশিয়া পোল্যান্ডকে বিভক্ত করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য ভাল মনে হচ্ছে না। তারা জার্মানিরসাথে জোট বেঁধেছে এবং নিজ সেনাবাহিনীকে পোল্যান্ডে প্রেরণে হঠকারিতা দেখাচ্ছে যেন তারা জার্মানি সহযে পোল্যান্ড দখলে করতে পারে এবং বিনা রক্তপাতে পোল্যান্ডের শাসনব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়।আর যদি এভাবে সফলতা অর্জন না হয় তাহলে এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানি পোল্যান্ডের উপর হামলা করে দেবে। আর অন্যান্য দেশ যদি এতে হস্তক্ষেপ না করে তাহলে ঠিক আছে, অন্যথায় জার্মানি পোল্যান্ডকে ধ্বংস করে দিবে এবং উভয় দেশ একে ভাগাভাগি করে নিবে। এ প্রবন্ধে হুজুর যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। হুজুর দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে মিত্রশক্তিকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন যা অত্যন্ত চমৎকার পরামর্শ ছিল।

(আনোয়ারুর উলুম, খণ্ড-১৬, পৃ: ১৩-১৪)

যাইহোক পোল্যান্ড বেঁচে গিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপরও তার গভীর দৃষ্টিছিল, যেভাবে আমি বলেছি এ বিষয়ে তার আরো প্রবন্ধ রয়েছে। ধর্মীয় সাহিত্য, তফসির, যেভাবে আমি বলেছি বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর জুমআর খুতবা, জামাতের বিভিন্ন জলসায় এবং অন্যান্য সময়ের বক্তৃতা সমূহ জ্ঞান এবং তত্ত্বের ভান্ডার আমাদের জন্য।

তফসীরে কবীর প্রথমে পুরনো ১০খন্ডে ছিল, এখন এতে আরো কিছু যুক্ত করা হয়েছে তার নোটের আলোকে যা নতুনভাবে ১৫খণ্ডে ছাপা হয়েছে। এতে আরো অনেকবিষয় স্ববিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আরো কিছু সূরার নোট হস্তগত, এগুলো যাচাই করা হচ্ছে। সম্ভবত যখন এগুলো ছাপা হবে তখন এটির ৩০ খণ্ডে সামনে আসবে। কেননা এগুলোর পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৩০হাজার।

সুতরাং আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সাথে ভবিষ্যদ্বাণীতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ সাহেবের জীবনে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। আমি কয়েকটি উদাহরণ আপনাদের সামনে এখনই উপস্থাপন করলাম।

তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এই ভান্ডার,এই সাহিত্য আমাদের পাঠের চেষ্টা করা উচিত। অনেক এমন কথা আছে যা বর্তমান যুগের জন্য খুবই উপযোগী। এর থেকে আমাদের লাভবান হতে হবে, আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

আমি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, সেটিই আমাদের ঈদ হতে পারে যা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঈদ। আমরা ঈদ পালন করছি অথচ সেটি যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঈদ না হয় তবে সেটিকে কোনও মতেই ঈদ বলা যাবে না। বরং সেটি হবে শোক পালন। যেমনটি কারো বাড়িতে যদি মৃতদেহ পড়ে থাকে, পরিবারের কোনও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মারা যায়, তবে লক্ষ লক্ষ ঈদের চাঁদ উদিত হলেও সেটি শোকেরই দিন হবে। অনুরূপভাবে আজ থেকে তেরো বছরের বেশি সময় পূর্বে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যু হলেও মুসলমানদের ঈদে যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) অন্তর্ভুক্ত না থাকেন এবং বাহ্যিক ঈদেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে সেই ঈদ কোনও কাজের নয়। নিঃসন্দেহে এই দিনটিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আনন্দ উদযাপন করার আদেশ করেছেন আর আমরা আনন্দ উদযাপন করতে বাধ্য থাকি, কিন্তু তবুও আমাদের অন্তরসমূহকে রোদন করতে থাকা উচিত। কেননা এখনও মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এবং ইসলামের ঈদ আসে নি। মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) ঈদ সেমাই ও মিষ্টি খাওয়ার ফলে আসে না, বরং সেই ঈদ আসে কুরআন এবং ইসলামের প্রসারের ফলে। কুরআন ও ইসলাম প্রসার লাভ করলে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের ঈদে অংশগ্রহণ করবেন এবং তিনি এই ভেবে আনন্দিত হবেন যে, 'যদি আমার মৃত্যুর তেরোশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছিলাম তা আমার জাতি এখনও পর্যন্ত বজায় রেখেছে।'

অতএব, চেষ্টা কর ইসলাম ও কুরআন করীমের প্রসার করার যাতে আমাদের ঈদে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)ও অংশগ্রহণ করেন। আজকের দিন যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঈদ হয় তবে এটি সমস্ত মুসলমানের ঈদ। কিন্তু আজকের এই ঈদে যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) সামিল না থাকেন, তবে মুসলমানদের জন্য এটি নয় বরং শোকের দিন। অতএব, এই বিষয়টি স্মরণ রাখবেন। নিঃসন্দেহে আমাদের জামাত ইসলামের তবলীগের সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু আমরা একথা বলতে পারি না যে, এই জিনিসটা আমাদের মাঝে ততটা প্রচলন পেয়েছে যে আমাদের সন্তানদের মাঝেও শত শত বছর ধরে প্রবাহমান থাকবে।

(খুতবা ঈদ, ২রা মে, ১৯৫৭)

রোযার একটি আধ্যাত্মিক কল্যাণ এটাও যে, এর দ্বারা মানুষ খোদা তা'লার সঙ্গে সাদৃশ্য লাভ করে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

রোযার একটি আধ্যাত্মিক কল্যাণ এটাও যে, এর দ্বারা মানুষ খোদা তা'লার সঙ্গে সাদৃশ্য লাভ করে। খোদা তা'লার একটি গুণ হল তিনি নিদ্রা থেকে পবিত্র। মানুষ পুরোপুরি তো নিদ্রা ত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু সে নিজের নিদ্রার কিছুটা অংশ খোদার তা'লার জন্য অবশ্যই ত্যাগ করতে পারে। সেহরী খাওয়ার জন্য উঠে, তাহাজ্জুদ পড়ে, যে মহিলারা রোযা রাখে না, তারাও সেহরীর ব্যবস্থার জন্য জাগে, কিছু সময় দোয়া ও নামাযে ব্যয় হয়। এইরূপে রাত্রের খুব সময় ঘুমানোর জন্য পাওয়া যায়। ....অনুরূপভাবে খোদা তা'লা পানাহার থেকে মুক্ত। মানুষ সম্পূর্ণরূপে পানাহার ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু তবুও রমযানে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে এক প্রকার সাদৃশ্য অবশ্যই তৈরী করে নেয়। অনুরূপভাবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কেবল কল্যাণই প্রকাশ পায়, অনুরূপভাবে রোযার মাসে মানুষকেও বিশেষ করে পুণ্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। রসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পরনিন্দা ও পরচর্চা এবং গালমন্দ ও নোংরা কথাবার্তা থেকে বিরত থাকে না, তার রোযা হয় না। অর্থাৎ মোমেনও চেষ্টা করে, তার থেকে যেন কেবল পুণ্যই প্রকাশ পায় আর পরনিন্দা ও বিবাদ এড়িয়ে চলার।

একবার আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হল যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হয়েছে?আমি বুঝতে পারলাম যে, তৌফিক লাভের জন্য, যাতে এর দ্বারা রোযার তৌফিক লাভ হয়। খোদা তা'লাই তৌফিক দান করেন আর প্রত্যেকটি জিনিস খোদা তা'লার কাছেই যাচনা করা উচিত। খোদা সর্বশক্তিমান, তিনি চাইলে অসুস্থ ব্যক্তিকেও রোযা রাখার সামর্থ দান করতে পারেন। ফিদিয়া দানের উদ্দেশ্য সেই শক্তি ও সামর্থটুকু অর্জন করা। আর সেটা খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে লাভ হয়। অতএব, আমার নিকট এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ যেন এই দোয়া করে যে, হে খোদা! এটা তোমার আশিসময় মাস, এর থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি, জানি না আগামী বছর জীবিত থাকব কি না, কিম্বা এই পরিত্যক্ত রোযাগুলি পালন করতে পারব কি না। (এই অনুনয়ের পর) যদি সে খোদার কাছে তৌফিক চায়, তবে আমার বিশ্বাস, এমন হৃদয়কে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir